আনন্দমেলা
২·৫০
এই সংখ্যায়
আনন্দ বাগচীর
সম্পূর্ণ গোয়েন্দা-উপন্যাস
মৃত্যুর টিকিট

নিম টুথপেস্ট–
আপনার দাঁত আর মাড়ি সুস্থসবল রাখার প্রকৃতিদত্ত উপায়

নতুন প্যাকে এবার নতুন স্বাদ আর প্রচুর ফেনা

নিমের ওষধি আর তেলের অ্যান্টিসেপ্টিক ক্ষমতা আরও ভালোভাবে কার্যকর করতে নিম টুথপেস্টে এখন পাবেন বাড়তি ফেনা।

সেইসঙ্গে এক নতুন স্বাদ, যা মুখে রেখে যাবে ঝরঝরে তাজা ভাব।

আপনার পরিবারের দরকার আপনার ভালোবাসা আর যত্ন। আর আপনার পরিবারের সকলের দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখতে আপনার প্রয়োজন নিমের সাহায্য।

লক্ষ্য করুন আনকোরা নতুন প্যাক!

নিম

নিমের প্রথম হার্বাল টুথপেস্ট ৬০ বছর আগে ভারতে প্রথম উৎপন্ন

ক্যালকেমিকোর সামগ্রী, সেরা জিনিষের সমঝদারদের জন্য

8465A/4 BEN

কে বা জানে বিরাশিতে
কার ছিল কী রাশিতে
কীরকম ফল।
তিরাশি মুছাক শোক
প্রতিটি জীবন হোক
সুখে উচ্ছল।

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে [illegible] রায় কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা।
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

২৭ পৌষ ১৩৮৯ ● ১২ জানুয়ারি ১৯৮৩
৮ বর্ষ ● ২০ সংখ্যা

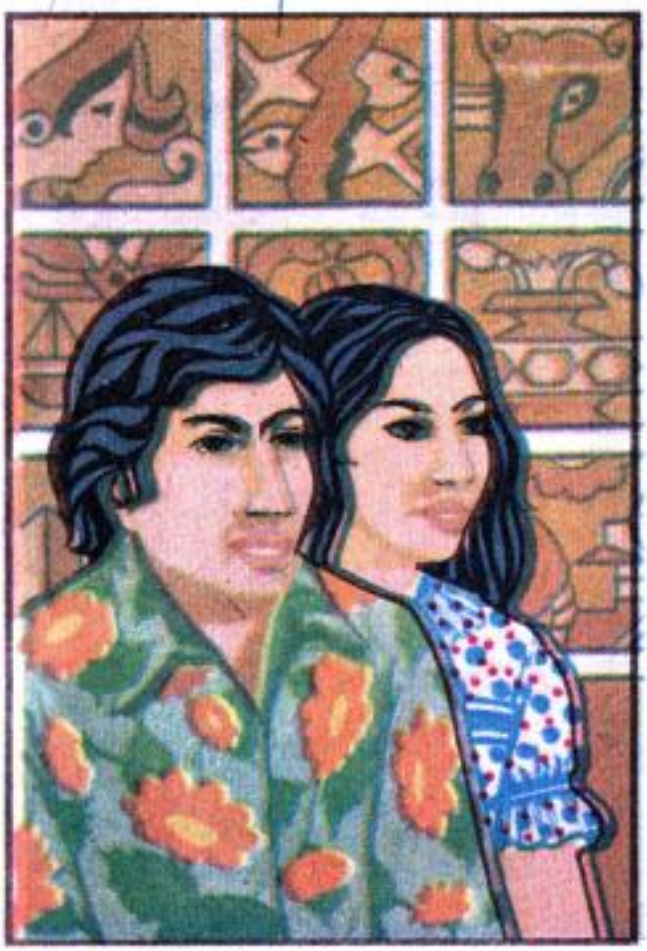

সম্পূর্ণ উপন্যাস
মৃত্যুর টিকিট। আনন্দ বাগচী ৫০
কবিতা ও ছড়া
শীত-বসন্ত। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪
নাস্তাপাড়ার পান্তাবুড়ি। রত্নেশ্বর হাজরা ৫
বারমাস্যা। মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু ১২
ভ্রমণকাহিনী
ব্যাভেরিয়া। অহিভূষণ মালিক ৬
ধারাবাহিক উপন্যাস
কুয়াশা। বুদ্ধদেব গুহ ১৯
জঙ্গলগড়ের চাবি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৫
গল্প
চাবি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৪
ঝেঁপুমামার কল্পতরু। অজেয় রায় ২৩
বাঘা আর বিবি। মুস্তাফা নাশাদ ৩২
স্মৃতিকথা
বসুবাড়ি। শিশিরকুমার বসু ২৯
অন্যান্য আকর্ষণ
বিজ্ঞান ১৩, খেলাধুলো ৮৩, ধাঁধা ৮০
শব্দসন্ধান ৮১, লেখাপড়া ৯২
তোমাদের পাতা ৯৪
এ ছাড়া নিয়মিত কমিকস ও অন্যান্য

প্রচ্ছদচিত্র : মুরিওর ভিখারি বালক

আগামী সংখ্যায়
অদ্রীশ বর্ধনের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
অজানা রঙ

শীত-বসন্ত

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হৃদয় যখন দুরুদুরু
গাছের জীর্ণ পাতার,
ঠিক তখনই পৃষ্ঠা শুরু
ইংরেজি হালখাতার।

খসছে পাতা, উড়ছে বালি,
জমছে ধুলো দাওয়ায়,
দিচ্ছে তবু কে হাততালি
শীতের শুকনো হাওয়ায় ?

হাততালি দেয় আড়াল থেকে
বসন্ত নির্ভয়।
বনের বুকে সে দেয় এঁকে
নবীন কিশলয়।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

নান্তাপাড়ার পান্তাবুড়ি

রত্নেশ্বর হাজরা

ডোবায় পুষে রাখত কুমির,
শিঙ্গি জলের কলসিতে
নান্তাপাড়ার পান্তাবুড়ির
বাপের বাড়ি গলসিতে।
গলসিতে তার এক জোড়া
লম্বা গোঁফে মাখত ঘি
পাশবালিশে রাখত ভরে
তুলোর সাথে চক্‌মকি।
রনপা পরে খেলত দাবা,
রনপা পরে খেলত তাস
ট্যারিস্ট হত রনপা পরে
মালদা থেকে হণ্ডুরাস।
সেই যে যেবার—বাবুই পাখির
বাসায় চড়ুই পাড়ল ডিম
সেই যে যেবার—বোশেখ মাসের
দুপুরবেলায় পড়ল হিম
সেই যে যেবার—কাকতাড়ুয়ার
জামায় আটকে মরল কাক
অলীক ফিরিঅলা যেবার
পুজোয় ফিরি করল ঢাক—
সেবার পান্তাবুড়ির কাছে
দু' ভাই এল একসাথে
বসল খেতে রনপা পরে
রান্নাঘরে মাঝরাতে—
পান্তাবুড়ি পান্তা দিল
সঙ্গে একটু জলপড়া
ঈশান কোণে মাটির নীচে
মোহর ছিল তিন ঘড়া।

ছবি : অনুপ রায়

ব্যাভেরিয়া

অহিভূষণ মালিক

মুনচেন ব্যাভেরিয়ার রাজধানী। পশ্চিম জার্মানির একটি রাজ্য এই ব্যাভেরিয়া। ব্যাভেরিয়ার বাসিন্দাদের দারুণ সুখ্যাতি। তাঁদের মতো খানাপিনা আর কোথাও পাবে না। অতিথির আদর-যত্নের সীমা থাকে না। ধরো, তোমরা কেউ গেলে ব্যাভেরিয়ায়, রোজই দেখবে নতুন-নতুন সব খানা তোমার খাবার টেবিলে এসে যাচ্ছে। তবে যদি পরিচিত কারও বাড়িতে ওঠো জেনে নেবে সে সত্যিই ব্যাভেরিয়ার আদি বাসিন্দা কিনা। যুদ্ধের সময় ব্যাভেরিয়ায় বহু শরণার্থী এসে হাজির হয়েছিলেন। আজ তাঁরা আদি ব্যাভেরিয়ানদের সঙ্গে মিশে গেছেন।

মুনচেন শহর লোকসংখ্যা, আয়তন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির বিচারে তৃতীয় স্থান অধিকারী। জার্মানির প্রথম শহর পশ্চিম বার্লিন। দ্বিতীয় শহর হ্যামবুর্গ। মুনচেন বেশ বড় শহর। তবে কলকাতার মতো বড় বলে মনে হয় না। মুনচেনে ঢুকে প্রথমেই তোমাদের যা ভাল লাগবে তা হল সেখানকার বাড়িঘরের চেহারা। সাবেক কালের চেহারা। আজ থেকে সাড়ে-তিনশো বছর আগে মুনচেন যেমন দেখতে ছিল, আজও প্রায় তেমনই আছে। রাস্তাঘাট, ট্রাম-বাস অবশ্যই এ-আমলের, কিন্তু পুরনো দিনের বাড়িগুলো আজও মুনচেনবাসীরা ঠিক আগের মতোই রেখে দিয়েছেন।

মুনচেনের বিশ্ব-অলিম্পিক খুব বেশি দিনের কথা নয়। অলিম্পিক পার্ক দেখলে আন্দাজ করা যায় কতটা আধুনিক হতে পারে এ-কালের ডিজাইনাররা। কিন্তু যাই বলো আর তাই বলো, রোকোকো নকশার তুলনা হয় না। সারা মুনচেনে রোকোকোর ছড়াছড়ি। রোকোকো ব্যাপারটা বোঝো তো? অলঙ্কার। রোকোকো চিত্রকলায় থাকতে পারে, ভাস্কর্যেও থাকতে পারে। আবার, বাড়ি-ঘরের গায়ে, জানলার চারপাশে, থামে, খিলানে, কার্নিশে নানাভাবে নানা নকশায় থাকতে পারে। রোকোকোর চলন ইউরোপে আঠারো শতকের গোড়ায় শুরু হয়েছিল। ওই শতকেরই শেষের দিকে এর প্রভাব কমতে থাকে। অসংখ্য গির্জা রোকোকোয় কারুকার্য করা। কারুকার্যর মধ্যে ছোটখাটো কাজের পাশে বেশ বড়সড় ভাস্কর্যও আছে। শহরের চতুর্দিকেই রোকোকোর বাহার।

মুনচেন শহরে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। আলপস

মারিয়েনপ্লাৎস-এর জোকার (রঙের বাহারও দেখবার মতো)

মারিয়েনপ্লাৎস—মুনচেনের সবচেয়ে সরগরম অঞ্চল

পাহাড় খুব কাছে। শীতের সময় বরফ পড়ে। ইউরোপের বেশির ভাগ বাড়ির ছাত আমাদের এখানকার টালির ছাতের মতো দুপাশে ঢালু। বরফ পড়ে যাতে ছাতে জমা না হতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা।

মুনচেনের আলটে পিনাকোটেক দেখতে গিয়ে আমার কী অবস্থা হয়েছিল, বলি তোমাদের। আলটে পিনাকোটেক প্রকাণ্ড বড় এক বাড়ি। রঙচঙে একেবারেই নয়, বরং বলা যেতে পারে, একটু বে-রঙা। যুদ্ধের সময় আলটে পিনাকোটেকও হাওয়াই-হামলা থেকে রেহাই পায়নি। বোমার চোট খেয়ে জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, পুড়ে কালো কালো দাগ পড়ে গেছে দেয়ালে। কিন্তু ওদের কি আর টাকার অভাব হয়েছিল যে মেরামতি হয়নি? কোটি কোটি ডি এম (জার্মানির টাকা) খরচ করে, হালফ্যাশনের প্রকাণ্ড সব বাড়ি উঠেছে নিও পিনাকোটেকে। গ্রীক ভাষায় পিনা মানে আর্ট, আর কোটেক হল আগার বা সংরক্ষণাগার, অর্থাৎ আর্ট মিউজিয়াম। আলটে মানে পুরনো, নিও মানে নতুন।

আলটে পিনাকোটেকের বাইরেটা চোট-খাওয়া অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে ইচ্ছে করে। আর নিও পিনাকোটেক, যেখানে উনিশ শতক এবং সাম্প্রতিক চিত্রকলা আর ভাস্কর্যের ঠাঁই, বেশ ঝকঝকে ও অভিনব। কিন্তু আলটে পিনাকোটেকের গাম্ভীর্যই আলাদা। ব্যাভেরিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের রাজত্বকালে আলটে পিনাকোটেক তৈরি হয়েছিল। সালটা ১৫২৮। তখনও জার্মানি বলে কোনও দেশ জমাট বাঁধেনি। প্রুশিয়া, ব্যাভেরিয়া, ব্রেমেন, বাডেন ইত্যাদি নামে ছিল ছোট-ছোট রাজ্য। পরে ওই রাজ্যগুলিকে এক করে বিসমার্ক মস্ত এক জার্মানির সৃষ্টি করেন। সেই ছোট্ট রাজ্য ব্যাভেরিয়া কী বিশাল ব্যাপারই না করেছিল!

অরবিন্দ পরিমল ওয়ার্কস—
ভারতের অগ্রণী আগরবাতি রপ্তানীকারক
এখনও শীর্ষে।

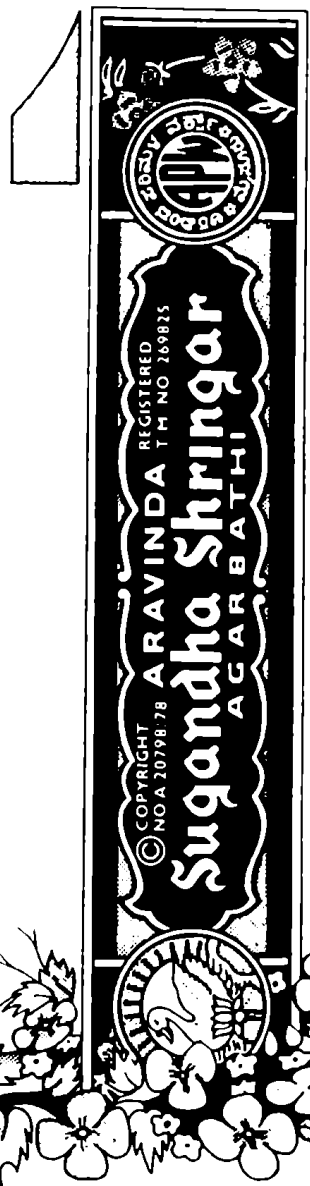

পরপর ৫ বছর অরবিন্দ পরিমল ওয়ার্কস অসাধারণ রপ্তানী কৃতিত্বের জন্য ৩০ ডিসেমবর, ১৯৮২ তারিখে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ভারত সরকারের পুরস্কার পেয়েছে। মাত্র ১০ বছরে অরবিন্দ পরিমল ওয়ার্কস ১টি আন্তর্জাতিক ও ৫টি জাতীয় পুরস্কার সমেত ২৫টি পুরস্কার পেয়েছে। অবিচল উৎকর্ষ আর বৈচিত্র্যময় সুগন্ধই তাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

অরবিন্দ পরিমল ওয়ার্কস—
আগরবাতির অনন্য স্রষ্টা

২৫টি
পুরস্কার ১০ বছরে

অরবিন্দ
পরিমল ওয়র্কস
মহীশূর-৫৭০০০৪

SURYA BEN 787

আলটে পিনাকোটেক পৃথিবী-বিখ্যাত আর্ট মিউজিয়াম। গর্ব করে মুনচেনবাসীরা বলেন, "দেখাও দেখি কোথায় আছে রুবেন্সের এত ছবি, কোথায় আছে ডুরের, ক্রানাক আর হলবিনের এত ছবি!" সত্যিই, আর কোথাও নেই, এমন কী পারির লুভ্‌রেও নেই। ডুরের, ক্রানাক আর হলবিন জাতে জার্মান, সুতরাং জার্মানির মিউজিয়ামে তাঁদের বেশি আদর হতেই পারে। কিন্তু রুবেন্স হলেন ফ্লেমিশ। বেলজিয়ামের উত্তরাঞ্চলকে আগে বলা হত ফ্ল্যাণ্ডারস, সেখানকার অধিবাসীরা ফ্লেমিশ। রুবেন্স ইতালিতে চাকরি করতে গিয়েছিলেন। ইতালির ভ্যাটিক্যান শহরের সিসটিন চ্যাপেলের চিত্রমালা দেখে তিনি একবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। সিসটিন চ্যাপেলের ছবি এঁকেছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মিকেলাঞ্জেলো। ভেনিসের তিসিয়ানও রুবেন্সের কম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না, কিন্তু দেখা যায়, মিকেলাঞ্জেলোর 'বারোক' রীতি রুবেন্সকে বেশি প্রভাবিত করেছিল।

তোমরা তো নাটক দেখেছ। নাটকে অভিনেতা কিছু ভাবপ্রকাশ করার জন্যে গলা চড়িয়ে কিংবা সুর করে কথা বলেন, মাঝে-মাঝে অঙ্গভঙ্গিও করেন যেটা স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছুটা বেশি হয়ে পড়ে। বারোক স্টাইল ব্যাপারটা তাই। ছবির চরিত্রগুলির অঙ্গভঙ্গি, পোশাক-আশাক আর ছবির রচনাতেও কিছুটা নাটকীয়তা ফুটে ওঠে। আলটে পিনাকোটেকে রুবেন্সের ছবি টাঙানো আছে একাধিক ঘরে। আর সে-সব ঘরও বিশাল-বিশাল!

দেখে অবাক হতেই হবে। আমাদের ঘরের চারখানা দেয়াল একসঙ্গে জুড়লেও বোধহয় একটা ছবিরও সমান হবে না। এইরকম ছবি কি একটা দুটো? সারি সারি। বাকি সব ঘরে অসংখ্য ছোট ছবি। ইউরোপের রাজা-মহারাজাদের সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী ছিলেন রুবেন্স। প্রায়ই তাঁর ডাক আসত ফ্রান্স থেকে, রাশিয়া থেকে, জার্মানি, ইতালি আর স্পেন থেকে। ইউরোপের সব রাজ্যেই রুবেন্সের কিছু-না-কিছু ছবি আছেই। রুশ সরকারের একবার অর্থ-তহবিলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে, তখন রুবেন্সের আঁকা একটি ছবি সরকারি সংগ্রহ থেকে বিক্রি করে সমস্যার সমাধান হয়। এবার অনুমান করো, আলটে পিনাকোটেকের সংগ্রহের মূল্য কী হতে পারে!

আমি পশ্চিম বার্লিনের ডালেম মিউজিয়ামে রুবেন্সের ইভ্‌কে দেখেছি, অ্যাডামকে দেখেছি, আর দেখেছি সেবাসচিয়ানকে, কিন্তু আলটে পিনাকোটেকের রুবেন্স আমাকে যে-ভাবে সম্মোহিত করেছিলেন, তা বলে বোঝাবার ভাষা নেই আমার।

জার্মান শিল্পী ডুরের মিকেলাঞ্জেলোর চেয়ে প্রায় চার বছরের বড়। জন্মেছেন ব্যাভেরিয়ার আর এক শহর নুরেমবার্গে, ১৪৭১ সালে, রুবেন্সের জন্মের ১০৬ বছর আগে। রেনেসাঁস শিল্পী। ইনিও দীক্ষালাভ করেছিলেন ইতালিতে। পেইন্টিং ছাড়াও কাঠ-খোদাই ও কপার এনগ্রেভিংয়ে এঁর সমকক্ষ শিল্পী মেলা মুশকিল। জার্মান চিত্রকলায় ডুরেরই প্রথম, মানুষকে মানুষরূপে দেখানোর গ্রীক শিল্পে যে রীতি ছিল, তার প্রবর্তক। উড-কাট এবং এনগ্রেভিং করে ছাপ তোলা ছবি করায় আজও এমন কেউ নেই যাঁকে ডুরেরের পাশে বসানো যায়।

ডুরেরের বিখ্যাত তেলমাধ্যমের কাজ 'ফোর অ্যাপসলস্' এবং 'পমগার্টনার অলটার' আলটে পিনাকোটেকের সম্পত্তি। দুই দিকপাল জার্মান শিল্পী হলবিন আর লুকাস ক্রানাকের কলাবিদ্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে যেতে হবে তোমাদের ওই আলটে পিনাকোটেকে। আরও একটা

একটি অতি প্রাচীন ভাস্কর্য আর দুটি রোকোকোর নমুনা

গর্ব করার বিষয়—রাফেলের ম্যাডোনা আর তাঁরই সমসাময়িক কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর ধর্মীয় চিত্রকলা। রেমব্রান্ট, মুরিও প্রমুখ শিল্পীর রচনার সংখ্যা বেশি না হলেও এখানে যা আছে তা সেরা কাজ। স্পেনের শিল্পী মুরিও। অসাধারণ ছিল তাঁর দক্ষতা আর কলাকৌশল। তাঁর 'ভিখারির ছেলে' দেখলে বোঝা যায় কতটা দরদ দিয়ে তিনি ছবি আঁকতেন। মুরিওর (১৬১৭—১৬৮২) সময় বুভুক্ষু লোকের সংখ্যা ওদেশে নিতান্ত কম ছিল না। ওইসব লোকের কষ্ট মুরিওকে উদাসীন থাকতে দেয়নি। মুরিওকেও বারোক শিল্পী বলা হয়। ওলন্দাজ শিল্পী রেমব্রান্টের নাম কে না শুনেছে? যেমন তাঁর সুখ-দুঃখভরা জীবন, তেমনই তাঁর অনুভূতির বিভিন্ন বিকাশ। ছবির সামনে দাঁড়ালে, সেখান থেকে আর সরা যায় না।

এবার আসা যাক নিও পিনাকোটেক-এ। বাড়িটা দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল, সিনেমা হল কিংবা কোনও থিয়েটার। ভেতরে ঢুকে পড়ার পরে ধারণাটা পালটে গেল। এটাও আলটে পিনাকোটেকের মতোই সুসজ্জিত এক আর্ট মিউজিয়াম। উনিশ শতকের বিখ্যাত সব শিল্পীর চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য আছে এই নিও পিনাকোটেকে। প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা খরচ করে এই নিও পিনাকোটেকের বাড়ি তৈরি হয়েছে। এই মিউজিয়ামে কত কোটি টাকার ছবি আর মূর্তি আছে তার হিসেব আমার জানা নেই। স্পেনের মাস্টার-শিল্পী গোয়াইয়া থেকে শুরু করে, ফরাসি ইমপ্রেসনিস্ট—মানে, মোনে, সেজান, গগ্যাঁ, ফান গঘ হয়ে একেবারে 'আরট নুভো'-তে এসে শেষ হয়েছে এই বিরাট সংগ্রহ। ঘুরতে ঘুরতে পা তো ধরে যাবেই, খিদেও পেয়ে যাবে। কোথায় খাওয়া যায়—ভাবতে হবে না, মিউজিয়ামের মধ্যেই আছে চমৎকার রেস্তোরাঁ।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলে চোখে পড়বে নিখুঁত সব ভাস্কর্য। মুনচেনের অপেরা খুব বিখ্যাত। অপেরায় নাটক অভিনয় হয় গান গেয়ে। পোশাক-আশাকে বাহুল্য আছে, আর সব কথোপকথনই হয় গানের সুরে। অর্থাৎ গান গাইতে না পারলে অপেরার অভিনেতা বা অভিনেত্রী হওয়া চলবে না।

অপেরা ভাঙতে বেশ রাত হয়ে যায়। তবে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, রাত্রি একটা-দুটোর সময়ও রেস্তোরাঁগুলো গম-গম করে। ইচ্ছে হল চিনে রান্না খাবে, ম্যাণ্ডারিন অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড দেখে ঢুকে পড়ো। কিন্তু কলকাতার চিনা রেস্তোরাঁর মতো ফ্রায়েড-রাইস আর

চিলি-চিকেন আশা কোরো না। চিনা ভাষায় সাইনবোর্ড থাকলে কী হবে, রেস্তোরাঁর ওয়েটার, রাঁধুনি, ম্যানেজার—সব জার্মান। চিনে মুখ একটাও দেখা যাবে না।

সমকালীন চিত্রকলায়, মুনচেনের নিজস্ব আন্দোলন—ব্লু রাইডার, বাংলা করলে দাঁড়ায় নীল সওয়ার। এই ব্লু রাইডার আন্দোলনের মধ্যমণি যিনি, তিনি কিন্তু জাতে জার্মান নন, রুশ। নিজের দেশ ছেড়ে এই রুশ শিল্পীটি, ওয়াসিলি কানডিনস্কি, মিউনিখে বসবাস করেছেন বহুকাল ধরে। সঙ্গী পেয়েছিলেন ফ্রাঞ্জ মার্ক আর পল ক্লীকে। ক্লী-ও নিজের জন্মভূমি সুইজারল্যাণ্ড ছেড়ে মিউনিখে থাকতেন। মিউনিখের চারপাশের সবুজ আর নীলে ভরা দৃশ্যই টেনে নিয়ে আসে কানডিনস্কিকে জার্মানিতে, কিন্তু পরবর্তীকালে কানডিনস্কিই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে কাটছাঁট করে অ্যাবসট্রাক্ট আর্টের সূচনা করলেন।

মুনচেনে শুধুমাত্র ব্লু রাইডারদের জন্যই একটি মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। বাড়িটি কোনও ধনী শিল্পরসিকের। মস্ত বাড়ি। গাবরিয়েল মুণ্টেরের কাছে ছিল কানডিনস্কির সব কাজ। গাবরিয়েল কানডিনস্কির ছবির মালিকানা সরকারকে

চিড়িয়খানায় সিলমাছ

দিয়ে দিয়েছেন। কানডিনস্কির ছবির সঙ্গে গাবরিয়েলেরও আঁকা ছবি ঝুলছে এই মিউজিয়ামে। তিনিও শিল্পী হিসেবে কিছু কম ছিলেন না। এই ব্লু-রাইডার মিউজিয়াম না দেখে মিউনিখ ত্যাগ করলে, যাঁর ভবিষ্যতে শিল্পী হবার ইচ্ছা, তাঁকে আপসোস করতে হবেই। মনে রেখো মুনচেনের ইংরেজি নাম মিউনিখ, আর ব্যাভেরিয়ার জার্মান নাম বায়ার্ন।

দুই-গম্বুজওয়ালা গির্জা
—এই নকশার গির্জা ইউরোপে
আর কোথাও দেখা যাবে না।

বারমাস্যা

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

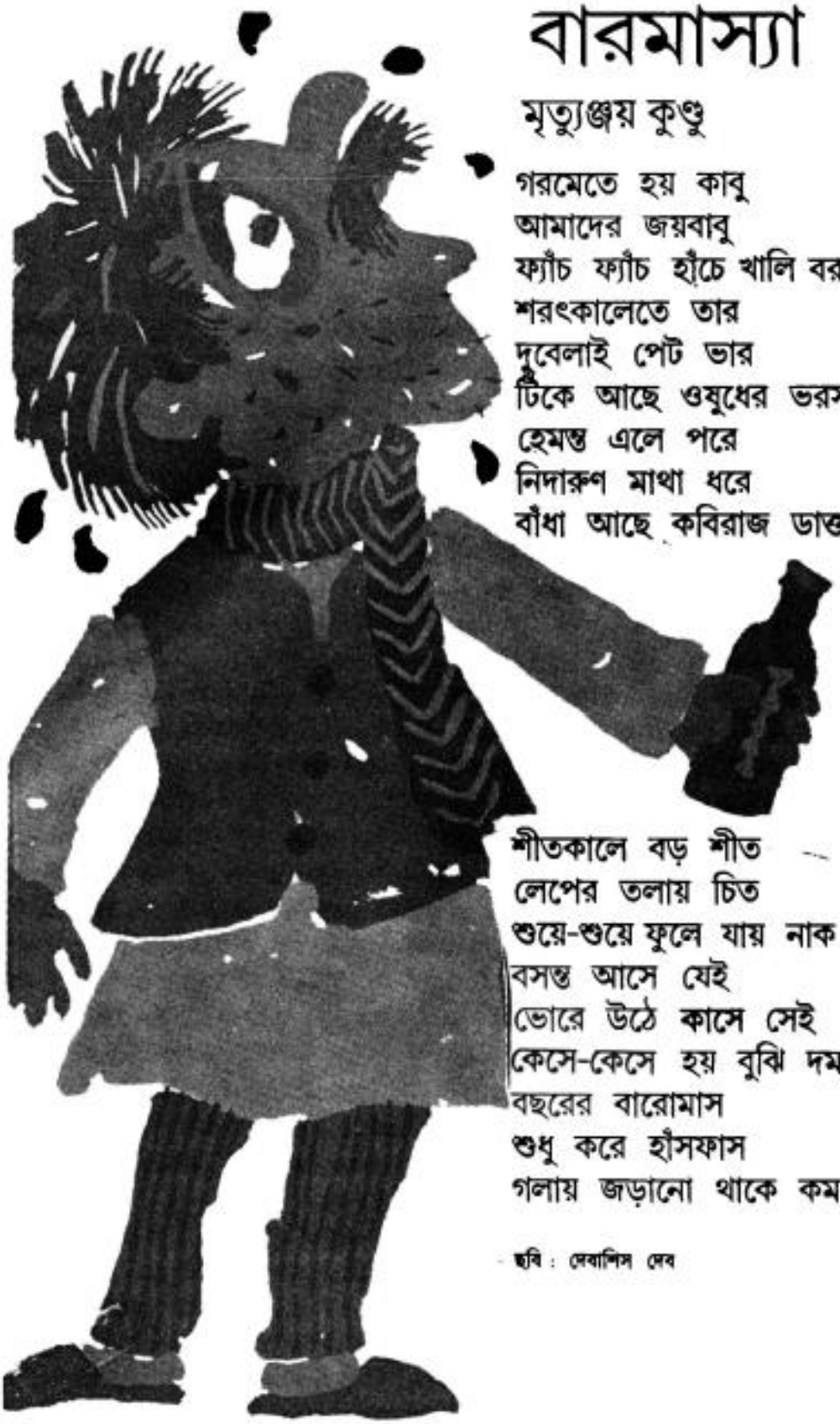

গরমেতে হয় কাবু
আমাদের জয়বাবু
ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাঁচে খালি বরষায়।
শরৎকালেতে তার
দুবেলাই পেট ভার
টিকে আছে ওষুধের ভরসায়।
হেমন্ত এলে পরে
নিদারুণ মাথা ধরে
বাঁধা আছে কবিরাজ ডাক্তার।

শীতকালে বড় শীত
লেপের তলায় চিত
শুয়ে-শুয়ে ফুলে যায় নাক তার।
বসন্ত আসে যেই
ভোরে উঠে কাসে সেই
কেসে-কেসে হয় বুঝি দমফট।
বছরের বারোমাস
শুধু করে হাঁসফাস
গলায় জড়ানো থাকে কমফর্ট।

ছবি : দেবাশিস দেব

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

চঞ্চল পাল

লক্ষ বছর ঘুম

রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলে শাক-সবজি, মাছ-মাংস অনেক দিন ভালভাবে থাকতে পারে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে যে-সব কোষ আছে সেই কোষগুলো আমাদের অজান্তে রোজই কিছু কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন সজীব কোষ তৈরি হয়ে সেগুলোর জায়গা দখল করছে। পুরনো কোষ নষ্ট হওয়া ও নতুন কোষ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটা দেখা গেছে খুব ঠাণ্ডায় খুব ধীরে ধীরে হয়।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা একটি উভচর সরীসৃপ আবিষ্কার করেছেন যেটি সাইবেরিয়াতে প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে হিমায়িত অবস্থায় চাপা পড়ে ছিল। সরীসৃপটাকে যখন জলে ছেড়ে দেওয়া হল, সেটা আবার বেঁচে উঠে চলাফেরা করতে লাগল। কিছুদিন আগে আর্জেন্টিনার লা-প্লাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ বছর আগেকার বীজ থেকে ফুল ফোটানো হয়েছে। ১৯৫৪ সালে কানাডার যুকোন নামক জায়গায় ১২ মিটার পুরু ঠাণ্ডা শিলাস্তরের ভিতর দশ হাজার বছর বয়সের পদ্মবীজ পাওয়া গিয়েছিল। কানাডার ন্যাশনাল মিউজিয়ামে এরা সম্পূর্ণ সুস্থদেহে বেড়ে উঠেছে।

সুতরাং হিমায়িত অবস্থায় কত বছর যে প্রাণীদের ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব তার সীমা এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

টক বৃষ্টি

কলকারখানার চিমনির ধোঁয়ায় সাধারণত সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকেই। এই গ্যাসটি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। তাই সারা পৃথিবীতেই বৃষ্টিতে ঐ অ্যাসিড কিছু না কিছু মিশে থাকছে। ১৯৭৪ সালের ১০ এপ্রিল ইউরোপের কয়েক জায়গায় বৃষ্টিপাতের অম্লত্ব ছিল ভিনিগারের মতো। ১৯৬৪ সালের নবেম্বরে আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে কয়েক স্থানে বৃষ্টির জল ছিল আরও টক।

এই টক বৃষ্টি যে কত বিপজ্জনক তা নিয়ে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা সবসময় আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। অম্লবর্ষণ শস্যদানার কোষ ও পাতার আলোক সংশ্লেষণ ক্ষমতা পঙ্গু করে দেয়। হাওয়াই দ্বীপে টক বৃষ্টির ফলে টমাটো গাছের বীজ ধারণের ক্ষমতা কমে গেছে। রাজস্থানের ভরতপুরে পক্ষীসংরক্ষণ কেন্দ্রের হ্রদগুলির ওপরে টক বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার দরুন ঐ অঞ্চলে বহু বিদেশী পাখি আর আসছে না।

মার্বেল পাথরের ক্যালসিয়াম কার্বনেট সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট তৈরি করে বলে পাথরে ছোপ ধরে ও চিড় খেয়ে যায়। তাই তাজমহল, লালকেল্লা ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেও এই রোগ সংক্রামিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর এই নতুন বিপদ নিয়ে পরিবেশ - বিজ্ঞানীরা বেশ মুশকিলে পড়েছেন।

চাবি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর, সময় রাত আটটা। জিপে করে দৌলতপুর থেকে কলকাতা ফিরছি।

জিপটি আমাদের অফিসের, চালাচ্ছে গোরাচাঁদ—মেকানিক কাম ড্রাইভার, সঙ্গে ফোটোগ্রাফার হীরেনদা। দৌলতপুরের কাছে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে। সেই যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করে ফিরছি। অন্তত রাত এগারোটার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে কালকের কাগজে খবর ধরাতে পারব না। এত পরিশ্রম বৃথা যাবে। আর শুধু কি পরিশ্রম। জীবনকে বাজি রেখে যুদ্ধের মধ্যে যাওয়া। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স ছাড়িয়ে আরও অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম যুদ্ধের জীবন্ত বর্ণনা দেব বলে। আমরা, সাংবাদিকরা, ব্যক্তিগত জীবনে খুব ভীরু। কিন্তু একবার কাজে নামলে মৃত্যুভয় ভুলে যাই, নয়তো আমি এখন নিজেই ভাবতে পারি না, এই কয়েক ঘন্টা আগে আমি প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মাঝে কী করে মাথা ঠিক রেখে যুদ্ধের বর্ণনা নোট করে নিচ্ছিলাম।

শীতের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, বাংলাদেশের অনেকখানি মুক্ত হয়েছে। এখন চলছে খুলনা দখলের লড়াই। মুক্ত অঞ্চলে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। যেমন যশোর শহর দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না, কিছুদিন আগে যুদ্ধ হয়ে গেছে এই শহরে। কিন্তু সন্ধ্যার পর সব নিঝুম হয়ে যায়। চারদিকে বিপজ্জনক চরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলে তাদের ভয়ে তটস্থ।

যশোর আর ঝিকারগাছার মাঝখানে

জিপ হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। "আপনার কাছে টর্চ আছে স্যার?" গোরাচাঁদ নেমে জিজ্ঞেস করল।

টর্চ আনতে ভুলে গেছি। এমনকী সিগারেট খাওয়ার নেশা নেই বলে দেশলাইও রাখি না। হীরেনদা দেশলাই বার করলেন। মাত্র দুটো কাঠি। ফস করে জ্বলে উঠে কনকনে দমকা হাওয়ায় নিবে গেল। গোরাচাঁদ অন্ধকারের মধ্যেই বনেট খুলে দেখতে লাগল গলদ কোথায়। না, কিছুই বার করতে পারছে না। আমরা শঙ্কিত হচ্ছি, হীরেনদা বললেন, "তোমার লেখা দেরি হলেও বেরুতে পারে। কিন্তু আমার ছবি আর কালকে বেরুবে না। ব্লকের লোক দশটার পর চলে যায়।"

হয়তো সারারাত এই খোলা জিপে কাটাতে হবে। তারপর জায়গাটা কতখানি নিরাপদ কে জানে। খুচখাচ খুন, বন্দুকবাজি লেগেই আছে। জীবনের দাম বুলেটের দামের চেয়েও কম ওখানে!

এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে এক মূর্তির যেন আবির্ভাব হল। "মে আই হেল্প য়্যু?"

চমকে তাকিয়ে দেখি ইণ্ডিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম-পরা এক অফিসার, আবছা-আবছা মুখটা দেখা যাচ্ছে। শোলডার ব্যাচে অশোকচক্র ঝকমক করছে। পদমর্যাদায় মেজর, বললাম, "আমরা সাংবাদিক। গাড়ি খারাপ হয়ে বিপদে পড়েছি।"

"কোন্ কাগজ?"

কাগজের নাম বললাম।

"আরে বাঙালি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?"

"মেজর চক্রবর্তী। দেখি কী হয়েছে?"

মেজর চক্রবর্তী গোরাকে বললেন, "আপনি সরে যান। আমি দেখছি।"

গোরা সরে গেল। দেখলাম মেজর

চক্রবর্তী নিচু হয়ে কী করতে লাগলেন। তাঁর মাথাটা পুরো ঝুঁকে পড়েছে বনেটের ওপর। আমার দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওঁর শরীর বলে কিছু নেই। শুধু একটা ইউনিফর্ম বনেটের গায়ে হেলানো। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেল। মেজর চক্রবর্তী বললেন, "এইবার স্টার্ট দিন।"

গোরাচাঁদ স্টার্ট দিল। গর্‌র্‌ শব্দ করে গর্জন করে উঠল গাড়ি। হেডলাইটের আলোয় সামনের রাস্তাটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। "আলো নেবাও।" চিৎকার করে উঠলেন মেজর চক্রবর্তী।

আমি, হীরেনদা, গোরাচাঁদ তিনজনেই ওঁর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে হতবাক। আলো নেবাল গোরাচাঁদ। মেজর চক্রবর্তী বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আলো জ্বালালে শত্রুরা টের পেয়ে যেতে পারে।"

মেজর চক্রবর্তী বললেন, "এখুনি কলকাতা যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমার একটা উপকার যদি করেন।"

"বলুন না।"

"আপনার কাছে পেনসিল আছে। লিখে নিন, গগনবিহার, অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর এইট, রেসকোর্স প্লেস, কলকাতা, এটা আমার বাড়ি। আমার স্ত্রীকে একটা জিনিস দিয়ে আসতে হবে।"

"কী জিনিস বলুন না?"

"একটা চাবি। তাড়াতাড়ি যুদ্ধে চলে আসি। আমার আলমারির চাবিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। কবে ছাড়া পাব জানি না। হয়তো আর নাও ফিরতে পারি। এই চাবিটা ওর খুব দরকার। এটা যদি ওকে দিয়ে দেন।"

আমি বললাম, "এটা আর এমন বেশি কথা কী। কালই গিয়ে দিয়ে আসব।"

"এই নিন চাবিটা।" আলগোছে একটা চাবি আমার হাতের ওপর ফেলে দিলেন মেজর চক্রবর্তী।

অদ্ভুত রহস্যময় ভদ্রলোক। কাছে আসছেন না। একটু দূরত্ব রেখে চলছেন। ওঁর গলার স্বরও যেন কেমন চাপা। ভাল করে ওঁর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। তবে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর বয়স খুব বেশি নয়। নাকের নীচে প্রকাণ্ড গোঁফজোড়া দেখতে পাচ্ছি। তবে মাথার টুপিটা কপাল পর্যন্ত নামানো। অলিভ রঙের ইউনিফর্ম পরনে।

চাবিটা নিলাম। "বাই-বাই" বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন মেজর চক্রবর্তী।

মেজর চক্রবর্তী সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে আসছিলাম। অদ্ভুত ভদ্রলোক। দিনের বেলা আলাপ হলে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে নানা খবর বার করা যেত ওঁর কাছ থেকে।

কলকাতায় ঠিক সময় পৌঁছেছিলাম। পরদিন সকালে খবরটিও বেরুল প্রথম পাতায়। খুলনা থেকে ফিরে বিশেষ প্রতিবেদন। একেবারে টাটকা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা।

তৈরি হচ্ছি ১৫ ডিসেম্বর সকালে আগরতলা যাবার জন্য। পরদিন সন্ধ্যার পরে ব্ল্যাকআউটের মধ্যেই হাজির হলাম মেজর চক্রবর্তীর ফ্ল্যাটে।

বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। রণক্ষেত্র থেকে ফিরছি। মেজর চক্রবর্তীর বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। চক্রবর্তী ভাল আছেন। সুস্থ আছেন। এই খবরটুকু অনেক দামি তাঁদের কাছে। বেল বাজাতেই এক মহিলা দরজা খুলে দিলেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ। মুখে চোখে শীতলতা। "আপনি?"

"আমি 'প্রতিদিন' কাগজের রিপোর্টার খুলনায় কভার করতে গিয়েছিলাম। মেজর চক্রবর্তী এই চাবিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্য।"

চাবিটা তাঁর হাতে দিতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভদ্রমহিলা। আমি অপ্রস্তুত। তাঁর কান্না দেখে ছুটে এলেন এক বৃদ্ধ। "সরমা কী হয়েছে?" ভদ্রমহিলা কাঁদতে-কাঁদতে

ভেতরে চলে গেলেন। বৃদ্ধ বললেন, "আপনি ?"

"আমি কাগজের রিপোর্টার।"

"মাফ করবেন। আমার মেয়ে কাউকে ইনটারভিউ দিতে পারবে না, তার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। অন্য কাগজের লোকেরাও এসেছিল। আমরা তাঁদের এ-কথাই বলেছি।"

"আমি ইনটারভিউ নিতে আসিনি। এসেছিলাম, মেজর চক্রবর্তী... মেজর চক্রবর্তী আপনার কে হন ?"

"আমার জামাই। গত পরশু সকালে সে মারা গেছে। কিলড ইন অ্যাকশন। আজ সকালেই আর্মি থেকে খবরটা জানায়। আমার একমাত্র মেয়ে, ছোট্ট তিনমাসের বাচ্চা আছে ওদের। হাউ টেরিবল ইজ দি শক।"

"মারা গেছেন ?"

"হ্যাঁ, আপনি জানতেন না ?"

"আমি যে তাঁকে মিট করলাম যশোরে। তিনি আমাকে তাঁর চাবিটা দিলেন, আমাকে দিয়ে আসতে বললেন। সেই চাবিটি আপনার মেয়েকে এইমাত্র দিয়েছি। কিন্তু মেজর চক্রবর্তী পরশু মারা গেছেন, কাল আপনারা জেনেছেন, সে কী করে হয় ?"

"কেন ? আপনি কবে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলেন ? ও মশাই শুনছেন ? আপনি কবে— ?"

ততক্ষণে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছি। গতকাল রাতে যে মেজর চক্রবর্তী আমার হাতে তাঁর বাড়ির চাবিটি তুলে দিয়েছিলেন তিনি তাহলে কে ? তিনি যদি মায়া হন, অলীক হন, চাবিটা তো মিথ্যা নয়।"

আমার যেন সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণে বুঝলাম, কেন আলো জ্বালতে বারণ করেছিলেন মেজর চক্রবর্তী।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

রাজকন্যা

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

এইখানে সেই রাজকন্যা
আলতা-পরা পায়
নাচ দেখিয়ে ভোরের কাছে
কুয়াশা হয়ে যায়।
রোদটা যখন চোখ মট্‌কে
তাকিয়ে থাকে মাঠে
রাজকন্যা তখন কি আর
স্নান করবে ঘাটে ?
এক আঁজলা জল তুলে নেয়
মুক্তো মানিক শিশির,
এসব কথা সত্যি জেনো—
চোখ দুটো যে পিসির।
দুপুরবেলায় শুকনো বাতাস
রাজকন্যার শাড়ি
উলটেপালটে নেবার জন্য
কী-ই যে কাড়াকাড়ি।
জ্যোৎস্না নামে, রাজকন্যার
পায়ের নূপুর বাজে,
তারার গাছি সাতনরি হার
রাজকন্যা সাজে।
পিসির মতো চারটে চোখের
মালিক তুমি হলে
যখন-তখন মাত করবে
এসব কথা বলে।

ফ্ল্যাশ গর্ডন

চালাও !
না না, আমার মনটাকে ধ্বংস কোরো না !
চালিয়ে যাও !
ওর মনটাকে আমার মুঠোর মধ্যে আনতে চাই !
নিরুপায় ফ্ল্যাশ আর্বোরিয়ায় রওনা হল...
আমি কি এই উড়ো-যন্ত্র চালাতে পারব ?
আমি তো আছি !
বটে ?
অরা বোতাম টিপতেই শূন্যে উঠল উড়ো-যন্ত্র...
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে পুব আফ্রিকায় পশুসম্পদ-চোরাইচক্রের সন্ধানে এসে ঋজুদা, রুদ্র ও তিতির বহু ঘটনার মুখোমুখি। পুরনো শত্রু ভুষুণ্ডার দেখা মেলে আরুশার হোটেলে। সেখানে আচমকা গোলাগুলি। এক নির্জন জায়গায় নাইরোবি-সর্দার ও দুই সাহেবের সঙ্গে ঋজুদার কথাবার্তা হয়। আসল অভিযানের দিন ওয়ানাবেরি এক দম-বন্ধ-করা গল্প বলে। এই নিগ্রোটি চোরাকারবারিদের দলে ছিল, এখন তাদের ধরিয়ে দিতে চায়। গোপন অভিযানে ওরা রুআহা ন্যাশনাল পার্ক হয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে পৌঁছে তিন পাহাড়ের মাঝখানে তাঁবু ফেলে। রাত্রে নানান বন্যজন্তুর উৎপাত চেঁচামেচি, পরদিন সকালে একদল হলদে বেবুনের হৈহৈ কাণ্ড— এসবের মোকাবিলা করার পর তাঁবু গুটিয়ে আবার যাত্রা শুরু। যেতে যেতে কোনো গাছ থেকে ভেসে এল অদ্ভুত এক ডাক, আর-একটা গাছ থেকে সেই ডাকের সাড়া পাওয়া গেল। তারপর—

॥ ১৬ ॥

এবড়ো-খেবড়ো পথ। পথ মানে, জিপের চাকা যেখান দিয়ে গড়িয়ে দিচ্ছি সেই ফালিটুকুই। সামনে নজর রাখছি টেডি মহম্মদ পাহাড়টা যেন হারিয়ে না যায়। মাঝে মাঝেই গাছগাছালির আড়ালে পড়ে যাচ্ছে পাহাড়টা।

দু' কিলোমিটার মতো আসার পর বাঁ দিকে একটা শুকনো নদী পেলাম। জিপ নদীতে নামিয়ে দেব কি না ভাবছি, কারণ নদীরেখা বরাবর চলে গেছে ঐ পাহাড়ের দিকেই। নদীতে নামিয়ে দিলে অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। পেছন থেকে 'কূ' দিল কারা ? তাদের 'কূ' যে আমাদের 'কু' বয়ে আনবে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

এখন পেছনে তাকালে কিমিবোওয়াটেঙ্গে পাহাড়শ্রেণী চোখে পড়ছে। সামনের বালি-নদীটা নিশ্চয়ই মাওয়াগুশি বালি-নদীর কোনো শাখা হবে।

দেখতে দেখতে ঋজুদাও এসে গেল। আমি আঙুল দিয়ে ইশারা করে শুধোলাম, নদীতে নামাব কিনা জিপ। ঋজুদা ইশারায় পারমিশন দিতেই স্পেশ্যাল গিয়ার চড়িয়ে নিয়ে নামিয়ে দিলাম। একেবারে অধঃপতন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' বইটি বড়দের বই হলেও, কায়দা করে মার লাইব্রেরি থেকে ম্যানেজ করে পড়ে ফেলেছিলাম। তাতে একটি জম্পেস ডায়ালগ আছে। সুশোভনকে নুটু মোক্তার বললেন, "ছিঃ ছিঃ তোমার এত বড় অধঃপতন ?" সুশোভন বললেন, "পতন তো চিরকাল অধঃলোকেই হয় নুটুদা, কে আর কবে ঊর্ধ্বলোকে পড়েছে বল ?"

তরতর করে জিপ চলতে লাগল। এখন আর কাঁটা-টাটার ভয় নেই। তবে টিউব যে কখন পাংচার হবে তা টিউবই জানে। খারাপ মানুষ স্টিয়ারিং-এ বসলে ওরা জায়গা বুঝে পাংচার হয়। প্রত্যেক গাড়ির টিউবই মানুষ চেনে। সামনেই নদীটা একটা বাঁক নিয়েছে, হঠাৎ। দূরের টেডি মহম্মদ পাহাড়টা আস্তে আস্তে কাছে আসছে। মনে হচ্ছে বেশ বড় বড় গুহা আছে পাহাড়টাতে। সকালের রোদে দূর থেকে তাদের উপর আলোছায়ার খেলা দেখে মনে হচ্ছে কোনো ভাল ক্যামেরাম্যান বা আর্টিস্ট আমাদের সঙ্গে থাকলে এই আলোছায়ার খেলা নিয়ে এক আশ্চর্য কবিতা লিখতে পারতেন। ফোটোগ্রাফি বা ছবি সবই তো

আলোছায়ারই খেলা। নদীর দুপাশে আবার অন্ধকার-করা নিবিড় তেঁতুলগাছ। আমার ঠাকুমার চেয়েও বয়সে কত বড় হবে এরা প্রত্যেকে। এদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে আমার। যে-কোনো মহীরূহ দেখলেই মনে হয়, যেন ইতিহাসের সামনে, কথা-কওয়া অতীতের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে। সকলের হয় কিনা জানি না। ঋজুদাই আমার সর্বনাশ করল। তার কাছ থেকে এমন এমন সব রোগের ছোঁয়াচ এল আমার ভিতরে যা এ-জীবনে কোনো ওষুধেই সারবে না আর।

এদিকে অনেক তালগাছও দেখছি। মা টবের মধ্যে নানারকম ক্যাকটাই করেন। ফুলের গাছের মতো সেগুলো বাইরের বাগানে না-রেখে বসবার ঘরে, বারান্দাতে রাখেন। এখানে একরকমের ক্যাকটাই দেখলাম। তাকে, ক্যাকটাই না বলে দ্য গ্রেট-গ্রেট গ্রাণ্ডফাদার অব ওল্ ক্যাকটাই বলা ভাল। এই গাছগুলোর নাম ক্যানডালাব্রা। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বলেন, ইউফোরবিয়া ক্যানডালাব্রাম। আফ্রিকার ইউফোরবিয়াই নতুন সভ্য পৃথিবীর ক্যাকটাই। গণ্ডাররা এর কাঁটা খেতে খুব ভালবাসে। বুদ্ধি মোটা না হলে কি আর অমন চেহারা হয়?

গণ্ডারের কথা ভাবতে ভাবতেই যেই নদীটার বাঁকে পৌঁছেছি এসে, অমনি দেখি, ঠিক সেই বাঁকের মুখেই নদীর বালির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন দুই বিশাল মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস গণ্ডারিয়া। তাদের কাঁধে বসে আছে হলুদরঙা এবং লাল-ঠোঁট এই দুই জাতেরই পোকা-খাওয়া পাখি। অক্স-পেকার। জিপ দেখেই বদখত চিৎকার করে পাখিগুলো গণ্ডারদের পিঠ ছেড়ে উড়ে গেল। এবং গণ্ডার দুটো জিপটাকে আরেকটা সাংঘাতিক গণ্ডার ভেবে খপর্-খাপর্ আওয়াজ তুলে অত্যন্ত আন্‌কুথ্‌লি আন্‌স্মার্টলি নদীর বুক ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেল। পেছনে চেয়ে

এশিয়াডের লাভ

এশিয়াড গেমস্ শেষ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে শেষ হয়েছে হারজিতের খেলা। কিন্তু এত বড় একটা আন্তর্জাতিক খেলাধুলার শেষে আমাদের জন্য শেখার রইলটা কি? খেলাতে যারা আগ্রহী তারা তো নানান রকম খেলা দেখে অনেক কিছু শিখেছো, জেনেছো। কিন্তু যারা খেলায় অংশ নিই না, তাদেরও খেলা দেখার মজা ছাড়া অনেকগুলো জিনিষ বোঝা হয়ে গেল। যেমন হার এবং জিৎ দুটোকেই সহজভাবে নেওয়ার ক্ষমতা একজন খেলোয়াড়ের থাকা চাই। পরে বড় হয়ে এই খেলোয়াড়ে মনোভাব সাধারণ জীবনেও কাজে দেবে। কোন রকম হারেই আর তোমরা ভেঙ্গে পড়বে না তাহলে।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে নানান দেশের মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ। বিদেশী তো বটেই, নিজের দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কত কত খেলোয়াড়ই তো এসেছিলেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা, খেলাধুলো ও একসঙ্গে ওঠাবসার মধ্যে দিয়ে এক রকম হৃদ্যতা গড়ে ওঠে তো? আবার এই সব টি ভিতে দেখে, কাগজে পড়ে তোমাদের মনেও সেই ভাব জেগে ওঠে। এটা একরকমের জাতীয় সংহতি বলতে পার। ভাবতে গেলে এশিয়াডের সবচেয়ে বড় অবদান এই ঐক্যের চেতনাটুকুই।

জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস কলিকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত।

দেখলাম, ঋজুদার জিপও আমার জিপের হাত-তিরিশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তিতির জিপের মাথার পর্দার জানলা খুলে দাঁড়িয়ে উঠে অনিমেষে দেখছে। গণ্ডারের মতো কুৎসিত জানোয়ারের কুৎসিততম লেজ যে এত কী দেখবার আছে জানি না! পারেও তিতির!

আর একটু এগোলেই টেডি মহম্মদ পাহাড়ের নীচে পৌঁছে যাব। ঋজুদা ঠিক জায়গাই বেছেছে মনে হচ্ছে ক্যাম্পের জন্যে। পাহাড়টা ন্যাড়ামতো উপরে, কিন্তু গায়ে গাছগাছালি আছে নানারকম। আছে গুহার চারপাশেও। অথচ পাহাড়ের নীচে বেশ কিছুদূর অবধি ফাঁকা। কারণটা কী তা ওখানে গেলেই বোঝা যাবে। হয়তো হাতিদের যাতায়াতের পথ আছে—গাছপালা সামান্য যা ছিল পথে, উপড়ে দিয়েছে তারা। যাইই হোক, পাহাড়ের কোনো গুহাতে যদি আস্তানা গাড়ি আমরা, তাহলে নীচটা ফাঁকা থাকাতে ঐ পাহাড়ের কাছে আমাদের চোখ এড়িয়ে কেউই আসতে পারবে না।

গণ্ডারগুলো দৌড়তে দৌড়তে আবার আমাদের দিকেই মুখ করে এগিয়ে আসছে। আসলে ইচ্ছে করে হয়তো নয়; নদীটা এমন ভাবে বাঁক নিয়েছে যে, ওদের পথের কাছাকাছি কেটে গেছে সে পথ। এইরকম গণ্ডার কিন্তু গুগুনোগুম্বারের দেশের সেরেঙ্গেটি প্লেইন্‌সে দেখিনি। এদের বলে 'ব্ল্যাক রাইনো'। আর সেরেঙ্গেটির গণ্ডারদের বলে 'হোয়াইট রাইনো'। আসলে ব্ল্যাক রাইনোর গায়ের রঙ কিন্তু কালো নয়, যেমন নয় হোয়াইট রাইনোর গায়ের রঙ সাদা। 'হোয়াইট' কথাটা 'ওয়াইড'-এর বিকৃতি। এখানকার গণ্ডারদের মুখ অনেক চওড়া হয় সেরেঙ্গেটির, মানে, গুগুনোগুম্বারের দেশের গণ্ডারদের চেয়ে। কেন চওড়া হয়, তা সহজে বোঝা যায়। কারণ এখানকার গণ্ডাররা চ'রে-বরে খায় গোরু-মোষের মতোই, অর্থাৎ যাদের ইংরিজিতে বলে 'গ্রেজার'। আর সেরেঙ্গেটির গণ্ডারেরা জিরাফের বা অ্যান্টিলোপদের মতো কাঁটাগাছ বা পাতা-পুতা গাছ মুড়িয়ে খায়, যাদের ইংরিজিতে বলে 'ব্রাউজার'। গণ্ডাররা চোখে কম দেখে, ভট্‌কাই-এর দাদুর মতো কিন্তু ঘ্রাণ এবং শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নাকের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও চিনতে পারেন না কিন্তু ওদের পাশের বাড়ির সমবয়সী মেয়ে বাণ্টি শীতের দুপুরে ধনেপাতা কাঁচালঙ্কার সঙ্গে কদ্‌বেল মেখে খেলে, অথবা ভট্‌কাই ছাদে বসে পরীক্ষার আগের দিন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ম্যাচের রিলে অত্যন্ত ক্ষীণ ভল্যুমে শুনলেও যেমন তিনি ঠিক গন্ধ পান এবং শুনতে পান, গণ্ডারদের ব্যাপার-স্যাপারও অনেকটা তেমনি।

ভট্‌কাইটাকে খুবই মিস করছি। 'অ্যালবিনো'র রহস্য ভেদ করার সময়ও বেচারা আসতে পারল না। আর এবারে উড়ে এসে জুড়ে বসল তিতির। যেন বায়না নিয়ে যাত্রাগান করতে এলাম আমরা। ফিমেল ক্যারেকটার ছাড়া যেন যাত্রা জমবে না।

ওরে ওরে ভট্‌কাই,
আয় তোকে চটকাই
জাপটিয়ে ধরি তোকে সোহাগে,
তিতির কাবাব হবে,
লিখন কে খণ্ডাবে?
উইমেনস্ লিব্? যত খট্‌কাই!

আহা! বাল্মীকির মতোই রুদ্র রায়চৌধুরীর মুখ দিয়েও অকস্মাৎ কবিতা বেরিয়ে গেল। বন-পাহাড়ের এফেক্টই আলাদা! যে-শাখায় ব'সে সেই শাখাই কাটছিলেন মহাকবি কালিদাস; সেই শাখারই অন্যদিকে যে রুদ্র নামের কোনো মহাকপি বসে সেই মুহূর্তে লেজ নাচাচ্ছিল না এমন কথা তো শাস্ত্রে লেখা নেই। কপির কবিতা বলে কতা! একেবারে জমজমাট, ফুলকপিরই মতো। (ক্রমশ)

রয়াল বেঙ্গল

রথীন্দ্রনাথ রায়

ভয় পেলে বুক ঢিপ-ঢিপ,
তারপরে কী? হাঁচি?
পাগল সেজে গেলেন খুড়ো
বাঘের ভয়ে বাঁচি।
ছলাত ছলাত নদীর চড়ায়
বাঘটা অপলক!
সোঁদরবনে একলা বসে
দেখছিল তাই বক!!

ছবি : দেবাশিস দেব

স্কুলের ছাত্রদের জন্য

পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও রয়েছে
বিরাট অজানা জগৎ!

তাই অজানাকে জানতে—
প্রশ্ন পাঠাও! জান!

'বিবিধ ভারতী'তে প্রতি শনিবার দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে।

SAMAR®

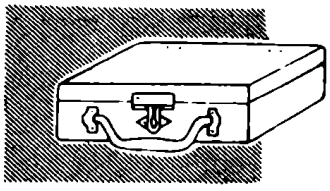

school box

নির্মাতা আয়োজিত বিশেষ
বেতার বিচিত্রা
"সময়টা সমরের"

ঘেঁচুমামার কল্পতরু

অজেয় রায়

ঘেঁচুমামার চিঠিটা হঠাৎ পেয়ে নাড়ু বেশ ঘাবড়ে গেল। ঘেঁচুমামা লিখেছেন—

স্নেহের নাড়ু,

কেমন আছিস ? ভালভাবে বি. এ. পাশ করেছিস জেনে খুশি হলাম। ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় আড্ডা না দিয়ে বরং এখানে ক'দিন ঘুরে যা। এ যুগের এক আশ্চর্যতম আবিষ্কারকে স্বচক্ষে দেখতে চাস তো দেরি না করে চলে আয়। ইতি তোর

ঘেঁচুমামা

পুঃ এখানে মুর্গি বেজায় শস্তা।

ঘেঁচুমামা হচ্ছেন নাড়ুর ছোটমামা। ঘোর বদরাগী ও খামখেয়ালি ঘেঁচুমামাকে আত্মীয়স্বজন যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। ঘেঁচুমামার এই খাপছাড়া স্বভাবের জন্য দায়ী তাঁর একটি নেশা—গবেষণা।

ঘেঁচুমামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁর কলকাতার বাড়ির এক ফালি জমিতে ও টবে তিনি নানান ফুল-ফলের গাছ লাগাতেন। নিত্য নতুন গবেষণা চালাতেন।

বাড়িতে লোকজন বেড়াতে আসা তিনি মোটে পছন্দ করতেন না। সঙ্গে ছোট ছেলে-মেয়ে আনা তো রীতিমত নিষিদ্ধ ছিল। তারা নাকি ঘেঁচুমামার রিসার্চ-স্টেশনে (অর্থাৎ বাগানে) ঢুকে পড়ত। ফুল-ফল ছিঁড়ত। এরপর মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভদ্রতা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত।

এই গাছপালা নিয়ে রিসার্চের নেশা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। নাড়ু শুনেছে, মাত্র বারো বছর বয়সে গ্রামের বাড়িতে বুনো মানকচুর কুটকুটুনি দূর করা নিয়ে ঘেঁচুমামা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেন। সেই কচুর একটা বন্ধু মেধোকে দেন। বলেন, একদম কুটকুটে নয়, খেয়ে দেখিস। ওই কচু ভাতে খেয়ে মেধোর বাড়ির সবার গলা ধরে একাকার। ঘেঁচুমামার বাবার কাছে নালিশ করা হয়। পিটুনি খাওয়ার ভয়ে ঘেঁচুমামা পালিয়ে গিয়ে হাওড়ায় তাঁর মাসির বাড়িতে সাত দিন লুকিয়ে ছিলেন। তখনই মেধোর পিসিমা খেপে গিয়ে তাঁর নামকরণ করেন—বেচু পালটে ঘেঁচু। অতঃপর তাঁর এই ডাকনামটাই চালু হয়ে গেল।

ঘেঁচুমামার মাথা ছিল খুব সাফ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো ভালভাবে উতরে গিয়ে তিনি কলকাতার একটা কলেজে অধ্যাপনা নিলেন। তবে গবেষণার নেশা কমল না, বরং বেড়েই চলল।

একবার তিনি কালীঘাটে নাড়ুদের বাড়িতে পাঁচ-ছ'টা কাঁচা লঙ্কা পাঠান। সঙ্গে চিরকুটে লেখেন—সাবধান। লঙ্কাগুলো সাধারণ লঙ্কা থেকে একশোগুণ বেশি ঝাল। তাই পড়ে নাড়ুর বাড়ির সবাই খুব হাসাহাসি করল। তার থেকে মাত্র একটি লঙ্কা মাছের ঝোলে পড়েছিল। ব্যাস্, সেই ঝোল-মাখা ভাত এক গরাসের বেশি কেউ মুখে তুলতে পারেনি। বাপ্ রে, কী আগুন ঝাল!

'উদ্ভিদ সমাচার'-এ ঘেঁচুমামা মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন। সেই সব নিতান্ত মৌলিক গবেষণামূলক রচনার আবির্ভাবে বিজ্ঞানী মহলে দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যেত। বিরূপ সমালোচনাই হত বেশি। ঠাট্টা-বিদ্রূপ কানে আসত। শেষটায় ঘেঁচুমামা সকলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলেন। প্রবন্ধও আর লিখতেন না। এর কিছুদিন বাদে তিনি কলেজ ছাড়লেন। তারপর কলকাতাও।

কলেজে একঘেয়ে পাঠ্যপুস্তক পড়ানো ঘেঁচুমামার নিতান্ত অপছন্দ ছিল। বরং তিনি ছাত্রদের উদ্ভিদবিজ্ঞানের নানা জটিল রহস্যের সুলুক-সন্ধান দিয়ে তাদের মনে জ্ঞানপিপাসা জাগাবার চেষ্টা করতেন। ফলে পরীক্ষার কোর্স শেষ হত না এবং ফি বছরই এই নিয়ে অভিযোগ উঠত। তাছাড়া সহকর্মীদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে অষ্টপ্রহর তর্কযুদ্ধ লেগেই থাকত। বিরক্ত হয়ে ঘেঁচুমামা কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি গবেষণায় মন দিলেন।

কিন্তু কলকাতায় থেকে শান্তিতে গবেষণা করা তাঁর বেশি দিন পোষাল না। কারণ পাড়ার লোকের সঙ্গে বেজায় খটাখটি লেগে গেল।

ঘেঁচুমামা তাঁর গাছপালার স্বাস্থ্য বিধির খাতিরে সকাল-সন্ধ্যা তাদের রাগ-রাগিণী শোনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাগানে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজত। দৈনিক ভোরে ও সন্ধ্যায় ক'টা একই রেকর্ড শুনতে শুনতে পাশের বাড়ির লোকদের কান তো ঝালাপালা। এদিকে প্রতিবেশী-বাড়িতে দুপুরবেলা রেডিওতে সজোরে আধুনিক বা ফিল্মি গান চালানো বরদাস্ত করতে পারতেন না ঘেঁচুমামা। ওতে নাকি তাঁর গাছেরা চমকে যায়। তাদের শান্তি নষ্ট হয়। ফলে ঝগড়া বাধল। এবং ঘেঁচুমামার বাগানে অদৃশ্য হস্তে ইট-পাটকেল, ডিমের খোলা, তরকারির খোসা ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হতে থাকল।

তখন 'দুত্তোর' বলে ঘেঁচুমামা কলকাতা ছাড়লেন। বিহারের দুমকায় নিরিবিলিতে অনেকখানি জায়গা-ঘেরা একটা বাড়ি নিয়ে শহরের বিষাক্ত পরিবেশ থেকে দূরে তিনি নিশ্চিন্তে গবেষণায় মন দিলেন।

এসব হল বছর-পাঁচেক আগেকার কথা। এরপর ঘেঁচুমামার খবর পাওয়া যেত কদাচিৎ। তবে মাঝে-মধ্যে তিনি নাড়ুকে এক-আধটা উটকো চিঠি ছাড়তেন। চিরকালই তিনি ভাগনে নাড়ুকে কিঞ্চিৎ লাই দিয়ে এসেছেন। বোধকরি নাড়ু তাঁর যুগান্তকারী বক্তব্যগুলো ধৈর্য ধরে শুনত বলে। নাড়ু কিছু বুঝত না ছাই। স্রেফ কিছু প্রাপ্তির আশায় ঘন্টাখানেক কষ্ট করে চোখ বড়-বড় করে শোনা এবং তাল মাফিক মাথা নেড়ে সায় দেওয়ার পরে মামার কাছে ফুচকা আলুকাবলি মায় সিনেমার পয়সার জন্য আবেদন করলেও মঞ্জুর হয়ে যেত।

আপাতত চিঠিটা পেয়ে কী করা যায় ভাবতে থাকে নাড়ু। যাওয়াই যাক। নাড়ু মাকে ধরল। চিঠির কথাটা গেল চেপে। বলল, "ঘেঁচুমামার কাছ থেকে ক'দিন ঘুরে আসি। অনেকদিন দেখিনি। দুমকা জায়গাটা শুনেছি খাসা।"

মা নাড়ুর বাবাকে বলে অনুমতি আদায় করে দিলেন।

নাড়ুকে দেখে ঘেঁচুমামা খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "এলি তাহলে। বেশ বেশ। এখন খা দা, ফুর্তি কর।"

চারটে দিন কাটল। ঘেঁচুমামার সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী। ঘেঁচুমামা এবং তাঁর পুরনো কাজের লোক গঙ্গারাম। ঘেঁচুমামা দিব্যি গল্প-গুজব করেন। নাড়ুকে নিয়ে বেড়িয়ে এলেন পাহাড়ে, মাঠে, নদীর ধারে। কিন্তু সেই আশ্চর্যতম আবিষ্কারের কথাটা আর তোলেন না। নাড়ু ছটফট করছে। শেষে বলেই ফেলল, "মামা, তোমার সেই আবিষ্কারটা ?"

"হবে হবে। তাড়া কিসের ? আচ্ছা বেশ কাল দেখাব," বললেন ঘেঁচুমামা।

পরের দিন বিকেলে চা খেতে খেতে ঘেঁচুমামা রহস্যময় আলাপ শুরু করলেন। "আচ্ছা নাড়ু, তোর নিশ্চয় বাগান করতে ভাল লাগে ?"

কোনও দিন বাগান করার উৎসাহ না হলেও মামাকে খুশি করতে নাড়ু তক্ষুনি সায় দিল, "হ্যাঁ লাগে।"

"তোদের বাড়িতে তো একটুখানি জমি। বেশি গাছ লাগাবার উপায় নেই।"

"হুঁ।"

"সত্যি ভারী মুশকিল।"

"কলকাতা শহরে ক'টা বাড়িতে আর অনেক গাছ লাগাবার জায়গা আছে ?" ঘেঁচুমামার ভাবনার মানে বোঝে না নাড়ু।

"আচ্ছা, তোর আম খেতে ভাল লাগে ?" জানতে চাইলেন ঘেঁচুমামা।

"ভীষণ।" নাড়ুর তৎক্ষণাৎ জবাব।

"কিন্তু এখন আম পাবি কোথায় ? কোল্ড-স্টোরেজে রাখা বাসি আম নয়। টাটকা, ফ্রেশ। চাইলেও পাবি না।" হতাশভাবে মাথা নাড়েন ঘেঁচুমামা।

নাড়ু বলল, "তা চাইব কেন ? এখন বুঝি আমের সময় ? ও তো গ্রীষ্মের ফল।"

"অর্থাৎ তোকে সেই গ্রীষ্মকাল অবধি হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে। কী সব বেআক্কেলে বন্দোবস্ত বল দেখি ?"

নাড়ু বলল, "বাঃ, তাই তো নিয়ম।"

"নিয়মটা পালটাতে হবে," ঘেঁচুমামা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন, "শোনা যায় পুরাকালে মুনি-ঋষিরা তপস্যার বলে কল্পতরু নামে এক রকম গাছ তৈরি করতেন। সেই গাছের কাছে যখন যা প্রার্থনা করা যেত তখনই নাকি তাই পাওয়া যেত। তা কলিযুগে সেরকম তপস্যার জোর আর নেই। কল্পতরুও তাই আর মেলে না। তবে হ্যাঁ, এখন হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কিছুটা ইচ্ছাপূরণ করা চলে। আর এই বিজ্ঞান সাধনার হিম্মতেই আধুনিক যুগ লাভ করবে ব্যাচারাম চাটুজ্যের আশ্চর্যতম আবিষ্কার—কলির কল্পতরু দ্য ওয়াণ্ডার।"

"সে আবার কী?" নাড়ুর প্রশ্ন।

"আয় আমার সঙ্গে।" উঠলেন ঘেঁচুমামা।

ঘেঁচুমামা নাড়ুকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে ঢুকলেন। প্রায় বিঘে দুই জমিতে নানা ফল ফুলের গাছ। উঁচু পাঁচিল ঘেরা। এই এলাকায় ঘোরা ঘেঁচুমামার অপছন্দ জেনে এতদিন বাগানে পা দেয়নি নাড়ু।

বাগানের একধারে অনেকটা জায়গা তারের জাল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে পাশাপাশি তিনটে গাছ। তারে ঘেরা অংশটায় ঢোকার জন্য কাঠের ফ্রেমে জাল আটকানো দরজা। দরজায় তালা দেওয়া। চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘেঁচুমামা ভিতরে ঢুকলেন—পিছনে পিছনে নাড়ু।

থামলেন ঘেঁচুমামা। গাছ-তিনটের দিকে আঙুল দেখিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "এই। এই এরা হচ্ছে কল্পতরু। এদের কাছে কড়া পাকের সন্দেশ বা টেস্ট-ক্রিকেটের সিজন টিকিট আবদার করলে অবিশ্যি পাবি না। তবে ইচ্ছেমতো নানান ফল যখন-তখন খেতে পাবি। দেখ। ভাল করে দেখ—"

দেখতে দেখতে নাড়ু থ'। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। এগুলো আবার কী গাছ? একটা গাছেই এক-একটা ডাল এক-একরকম। তাতে আলাদা রকম পাতা—ফল।

প্রথম গাছটা প্রায় দেড়মানুষ উঁচু। তাতে ফলছে হরেক রকম লেবু। কোনও ডালে কমলা। কোনওটায় বাতাবি। কোনওটায় মোসাম্বি। কোনও ডালে বা পাতিলেবু।

পরের গাছটা অনেক বেঁটে। তাতে ফলেছে টমাটো। নানান জাতের লঙ্কা। আবার কয়েকটা বেগুনও ঝুলছে।

তৃতীয় গাছটা প্রথম গাছটা থেকে উঁচু। সেটায় গুঁড়ি থেকে বেরিয়েছে আম, আমড়া, এবং কী এক অচেনা গাছের ডাল। ফল ধরেছে ডালে ডালে।

নাড়ুর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

ঘেঁচুমামা বললেন, "ঘাবড়ে গেছিস? লজ্জা কী? আমার কল্পতরু প্রথমে দেখলে অনেক বীরপুরুষেরই চক্কর লাগবে।"

"কী করে বানালেন?" নাড়ু গোল-গোল চোখ করে জানতে চাইল।

"প্লাস্টিক সার্জারির কায়দা," বললেন ঘেঁচুমামা, "নানান গাছের দেহ-কোষ জোড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে এক-একটা যৌগিক বৃক্ষ—মানে এই কল্পতরু। ব্যাপারটা জটিল। এত চট করে তোর মাথায় ঢুকবে না। তাছাড়া যাকে-তাকে বলে ফেলবি। এখুনি সব ফাঁস হয়ে যাবে। আগে পেটেন্ট নিই। তারপর এই বিষয়ে একখানা বই লিখব সোজা ভাষায়। তখন পড়ে নিস। মোটকথা এখন থেকে আর আলাদা-আলাদা গাছ লাগাবার ঝামেলা থাকবে না। প্রত্যেকটা গাছের জন্যে আলাদা আলাদা জমি, আলাদা তদ্বিরের দরকার নেই। বি, আর, চাটুজ্যের ফর্মুলা—১০১ অ্যাপ্লাই করে যে যার পছন্দমতো হরেক রকম ফল একই গাছে ফলাতে পারবি। জমি বাঁচবে। সময় বাঁচবে। তাছাড়া ফলনের সময়গুলোও ইচ্ছেমতো পালটে দেব। গ্রীষ্মে আম তো এমনই পাই। তখন বাজার থেকে আম

কিনে খাওয়া যায়। আমার কল্পতরু ফলাবে শীতকালে আম। ঐ দেখ।"

তৃতীয় গাছটার দিকে আঙুল দেখালেন ঘেঁচুমামা। "আর এই লেবুগাছটা দেখছিস ? সব শীতে ফলবে। কমলা না হয় শীতের ফল। মোসম্বি, বাতাবি শীতে ফলাতে পারবি ? আর একটা কল্পতরু লাগিয়েছি, সব ক'টা লেবু গ্রীষ্মে ফলবে। তখন গরমকালে কমলা পাবি এক্কেবারে টাটকা গাছপাকা। আবার কিছু-কিছু ফল বারবার খেতে পাবি। সাধারণত বছরে হয়তো একবার ফলে। আমার কল্পতরুতে ফলবে বছরে দু-বার, তিনবার।

"তা বলে কি বাপু একই গাছে যা ইচ্ছে একসঙ্গে চাইলে পাবি ? তা হয় না। মোটামুটি মিল আছে এমন সব গাছের মিশ্রণে এক-একটা কল্পতরু তৈরি সম্ভব। এই যেমন আপাতত তিনটে বানিয়েছি। কল্পতরু নাম্বার—ওয়ান, টু অ্যাণ্ড থ্রি। আরও কত কল্পতরু আবিষ্কার হবে। শুধু ফলের নয়, ফুলের, সবজির। যে-সব উদ্ভিদের মধ্যে এখনও মিশ খাওয়াতে পারিনি, পরে হয়তো পারব। আমি না পারলে তুই পারবি।"

"আমি !" নাড়ু আঁতকে ওঠে।

"হ্যাঁ। মানে তুই না হলেও অন্য কেউ। মানে যারা এই লাইনে রিসার্চ করবে আর আমাকে গুরুদেব বলে পেন্নাম ঠুকবে। হুঁ, এইবার দেখিয়ে দেব উদ্ভিদবিজ্ঞানের রথী-মহারথীদের ব্যাচারাম চাটুজ্যের দৌড় কদ্দূর। বুঝলি ?"

ফুর্তির চোটে নাড়ুর কাঁধে ফটাস করে এক চাপড় কষিয়ে ঘেঁচুমামা বললেন, "চ, এখন একটু বেড়িয়ে আসি। তাহলে রাতে খিদেটা বেশ চাগবে।"

রাতে খেতে বসে ঘেঁচুমামা দু-হাত ছড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "নাড়ু, আজ তোর জীবনে এক মহৎ দিন। জেনে রাখ, তুই হচ্ছিস প্রথম মানব যে আমার কল্পতরু ফল টেস্ট করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। এ গ্রেট গ্রেট অনার। তোর নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে। গঙ্গারাম—"

অমনি গঙ্গারাম খাবার টেবিলে এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল, রুটি মাংস টমাটো-স্যালাড, পুডিং এবং অনেক রকম ফল।

নাড়ু একখানা মুরগির ঠ্যাং তুলে কামড়ে দিতেই ঘেঁচুমামা বাধা দিলেন, "ও সব তো রোজই গিলছিস, আগে স্যালাড খা। টমাটোটা চাখ। কল্পতরু প্রোডাক্ট।"

টমাটো খেতে নাড়ুর ভাল লাগে না তাই এড়িয়ে যাচ্ছিল। নেহাত মামার কথায় বাধ্য হয়ে এক টুকরো মুখে পুরেই সে আর্তনাদ করে উঠল।

"কী হল ?" ঘেঁচুমামা ব্যস্ত হয়ে বললেন।

"উরিব্বাস্, কী ঝাল !"

"ঝাল !" ঘেঁচুমামা অবাক। "গঙ্গারাম কী ব্যাপার ! স্যালাডে এত ঝাল কেন ?"

"আমি তো বাবু মাত্তর আধখানা লঙ্কা কুঁচিয়ে দিইচি। ঝাল হবে কেন ?" গঙ্গারাম ভেবে পায় না।

"মামা, এ নিশ্চয়ই তোমার সেই স্পেশাল ব্রাণ্ড। সেই একশো গুণ ঝাল লঙ্কা," নাড়ু বাতলায়।

"না না, সে লঙ্কা দিই নাই। সে লঙ্কা আলাদা করা আছে।" গঙ্গারাম প্রতিবাদ জানায়।

"নিশ্চয়ই ভুল করে মিশিয়ে দিয়েছে," ঘেঁচুমামা হুংকার ছাড়েন, "দিন-দিন তোমার ভীমরতি হচ্ছে। ঠিক আছে নাড়ু, তুই বরং আমটা টেস্ট কর। মিষ্টি আম। জিভের জ্বলুনি কমবে।"

এক চাকলা আম মুখে দিয়েই নাড়ু মুখ ভেটকাল— "এঃ, কী বিশ্রী খেতে।"

"সে কী ! ভাল জাতের ল্যাংড়া।"

ঘেঁচুমামা নিজে এক চাকলা আম তুলে কামড় দিয়ে নাড়ুর মতোই মুখ করলেন।

"কেমন যেন আমড়ার টেস্ট, তাই না ? এ কোথাকার ল্যাংড়া ?" বলল নাড়ু।

"আমড়া ? হুম।" ঘেঁচুমামা গম্ভীর।

কিছু ছাড়ানো কমলালেবু ছিল প্লেটে। তাই থেকে এক কোয়া মুখে ফেলেই থু-থু করে উঠল নাড়ু।—"ইশ্ কী টক !"

"টক !"

"হ্যাঁ, যেন পাতিলেবুর মতন।"

"দেখি।" ঘেঁচুমামা নিজে এক কোয়া কমলা খেয়েই থু করে ফেলে দিলেন। বললেন, "এই কমলা তো টক হবার নয়। আমার বাগানে আগেও ফলিয়েছি। চমৎকার মিষ্টি। কী ব্যাপার ?" ঘেঁচুমামা থৈ পান না।

নাড়ুর মাথায় একটা আইডিয়া এল। সে এক টুকরো পাতিলেবু তুলে চুষে বলল, "বাঃ, এতে যে কমলালেবুর টেস্ট।" তারপর সে একটা কাঁচা লঙ্কা তুলে সাবধানে দাঁতে কেটে বলল, "এঃ, কেমন টমাটোর মতো। দেখ খেয়ে।"

ঘেঁচুমামা লেবু ও লঙ্কা চেখে মাথা ঝাঁকালেন, "হুঁ, ঠিক।"

"আমার কী মনে হচ্ছে জানো ?" বলল নাড়ু।

"কী ?"

"মানে, স্বাদগুলো বোধহয় ওলটপালট হয়ে গেছে।"

"হুঁ, তাই। কিন্তু আমার এতদিনকার সাধনা ? ওঃ সব গেল। ভেবেছিলাম কালই চিঠি ছাড়ব। ডেকে পাঠাব কয়েকজন সায়ান্টিস্ট আর কাগজের রিপোর্টারকে। দেখাব আমার আবিষ্কার। তাদের টেস্ট করাব আমার কল্পতরু প্রোডাক্ট। সব যে গুবলেট হয়ে গেল। ওফ্!"

"তাতে কী, এও তো দারুণ আবিষ্কার। নতুন রকম টেস্ট। বলা যায় নতুন ফল আবিষ্কার।" নাড়ু সান্ত্বনা দেয়।

"না না, ওসব নতুন-ফতুন বোঝে না লোকে। সবাই তো আর তোর মতন নয়। জানিস, একবার একটা নতুন সবজি বানিয়েছিলাম। আলু আর বেগুন মিশিয়ে। ভাবলাম, লোকে আলু-বেগুন ভাতে খেতে ভালবাসে। তা এই একটাতেই কাজ চলবে। কষ্ট করে আর আলাদা-আলাদা সিদ্ধ করে মাখতে হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চলল না। আমার আলুগুন কোনও বেটার মুখে রুচল না। গঙ্গারামটা অবধি রিফিউজ করল। নাঃ, আবার আমায় নতুন করে ভাবতে হবে। রিসার্চ করতে হবে। স্বাদগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে।"

ঘেঁচুমামা হাঁড়িপানা মুখ করে উঠে গেলেন।

এরপর ঘেঁচুমামার ওখানে আর জমল না। ঘেঁচুমামার গল্পগুজব বন্ধ। সারাদিন তিনি ল্যাবরেটরিতে বা বাগানে কাটান। নিজের মনে পায়চারি করেন। বিড়বিড় করে বকেন। খাবার টেবিলে একসঙ্গে বসলেও আনমনা। দু'দিন একা-একা এদিক-সেদিক ঘুরে কাটিয়ে নাড়ু বাড়ি ফিরে গেল।

প্রায় আড়াই বছর বাদে ঘেঁচুমামার চিঠি পেল নাড়ু। লিখেছেন—"তোর সব কটা চিঠিই পেয়েছি। উত্তর দেবার সময় পাইনি। এক্সপেরিমেন্ট চলছে। দুটো নতুন কল্পতরু লাগিয়েছি। তাদের প্রথম ফলনটায় সামান্য গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কমলার টেস্ট বাতাবি লেবুর মতো আর টমাটোগুলো কেমন বেগুন-বেগুন খেতে হয়েছিল। কিন্তু এবার লঙ্কাগুলোয় একেবারে খাঁটি লঙ্কার ঝাল। আর আমে আমড়ার স্বাদও অনেকখানি কমেছে। উপায় ভেবে ফেলেছি। খুঁতগুলো শুধরে ফেলব। আশা করছি শিগ্‌গিরি শিওর সাকসেস। তারপর গ্র্যাণ্ড সেলিব্রেশন। এক্সপেরিমেন্ট সফল হলেই খবর দেব। পত্রপাঠ চলে আসিস।"

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। ঘেঁচুমামার কাছ থেকে নাড়ু কিন্তু আর কোনও চিঠি পায়নি।

ছবি : দেবাশিস দেব

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

(৬৯)

১৯৪৭-এর স্বাধীনতার উৎসব খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। উৎসবের গানবাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি থেমেছে কি থামেনি, খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাংলায় শুরু হয়ে গেল গণহত্যার এক অভাবনীয় তাণ্ডবলীলা। লক্ষ-লক্ষ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন আশ্রয়ের আশায়। হিন্দুরা হিন্দুস্থানের দিকে, মুসলমানরা পাকিস্তানের দিকে। পাঞ্জাবেও হত্যা ও লক্ষ-লক্ষ লোককে তাঁদের বাস থেকে উপড়ে ফেলে যে দুই পাঞ্জাবের সৃষ্টি হল তার মধ্যে একটি হল বাস্তবিকপক্ষেই মুসলিম রাজ্য, অন্যটি যদিও ভারতের ভাগে পড়েছিল সেটি হল হিন্দু ও শিখদের রাজ্য। দুই দিকেই লক্ষ-লক্ষ উদ্বাস্তু। বাবা আগেই বলেছিলেন, বাংলায় কিন্তু ঐ ধরনের পরিবর্তন সম্ভব হবে না, কারণ সারা রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান বহুদিন ধরে এমন নিবিড়ভাবে মিলেমিশে আছে যে, পুরোপুরিভাবে আমাদের সমগ্র জনসংখ্যাকে ভাগ করে ফেলা সম্ভব নয়। যাই হোক, লক্ষ-লক্ষ পরিবার তাঁদের বহুদিনের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার স্রোতের মতো আসতে লাগলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে এটা চলল।

এই অবস্থায় বাবার অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁদের নিয়ে আগস্টের প্রথমে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি গড়লেন। নতুন দল গড়ার সময় বাবার মূল কথাই ছিল যে, আমাদের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ ও লক্ষ্যকে জাগিয়ে রাখতে হবে। দেশভাগ ও ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি কিন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মূল ভাবধারাকে আমাদের ছাড়লে চলবে না। তাছাড়া স্বাধীনতার পর দেশ গড়ে তোলার কাজে, আমাদের দরিদ্র জনগণের সার্বিক মঙ্গলের জন্য, আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সমাজবাদী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে, সেটাকে রূপ দিতে হবে। যে সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির বিষ আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সেটাকে দূর করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। সেটা আমরা করতে পারব যদি জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় এবং দেশের সব সমস্যা জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা আমাদের জাতীয় কর্মসূচী ঠিক করি। তিনি আরও বলেছিলেন যে, কে প্রকৃত বামপন্থী এবং হঠকারী বামপন্থী এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। যাঁরা কেবল নেতাজির নাম ব্যবহার করেন কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পথে চলেন না তাঁদেরও চিনে নিতে হবে।

১৯৪৭-এর প্রথমেই কলকাতায় একটি সম্মেলনে বাবা আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের ডাক দিয়েছিলেন দলবদ্ধভাবে এবং সক্রিয়ভাবে দেশের জনজীবনে প্রবেশ করতে এবং নেতাজির আদর্শ, মতবাদ ও নীতির ভিত্তিতে কাজ করতে। দেশে যাঁরা যুদ্ধের আগে ও পরে রাঙাকাকাবাবুর অনুগামী ছিলেন তাঁদেরও

গান্ধীজি ও শরৎচন্দ্র (১৯৪৭)

তিনি ডেকেছিলেন ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাবা কোনো দিক থেকেই ভাল সাড়া পাননি। ফলে বড় রকমের নতুন দল গঠন করতে বাবা পারেননি। আগেকার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর নেতা ও কর্মিবৃন্দ সুখে-দুঃখে বাবার সঙ্গে সর্বদাই ছিলেন। তাঁদের নিয়েই বাবা কাজ চালিয়ে গেলেন।

বাবার একটা বড় দুঃখ ছিল যে, মহাত্মা গান্ধী দেশভাগের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যখন কংগ্রেস দেশকে খণ্ডিত করার প্রস্তাব মেনে নিতে চলেছে তখন জোরের সঙ্গে বাধা দিলেন না। সেই সময় গান্ধীজি বাংলায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। বাবা তাঁর সঙ্গে তখন প্রায়ই দেখা করতে যেতেন এবং দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন। বাবা গান্ধীজিকে বারবার বলেছিলেন, আজও যদি আপনি আপনার কড়ে আঙুল উঁচিয়ে একবার বলেন যে, দেশভাগ করা চলবে না তাহলেই কাজ হবে। কিন্তু গান্ধীজি উত্তরে বলেন যে, তাঁর আর সে প্রভাব নেই, দেশের নেতৃবৃন্দের উপরেও নেই, দেশের জনসাধারণের উপরেও নেই।

১৯৪৮-এর প্রথমে আমাদের বিদেশনীতি সম্বন্ধে বাবা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছিলেন। প্রথমত তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমাদের বৃহৎ শক্তি দুটির মধ্যে কারুর সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা উচিত হবে না। আমাদের বিদেশনীতি হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে স্বাধীন বিদেশনীতি রক্ষার জন্য দুটি পদক্ষেপ আমাদের নিতে হবে। এক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়তে হবে। দুই, ভারতকে এক শক্তিশালী সামরিক শক্তিরূপে গড়ে তুলতে হবে। এই সূত্রে মনে পড়ল বাবা স্বাধীনতার আগে থেকেই, বিশেষ করে স্বাধীনতা অর্জনের পর, জোরের সঙ্গে বলতেন, আমাদের দেশের যুবকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই।

১৯৪৮-এর জানুয়ারির শেষ দিন মহাত্মা গান্ধীর হত্যার খবর যখন রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছিল তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। বাড়িতে ফিরে দেখলাম, বাবা গান্ধীজির শেষকৃত্যে যোগ দেবার জন্য পরের দিন ভোরের দিল্লির এরোপ্লেনে একটি আসনের জন্য চেষ্টা করছেন। বাবা তো সহজে বিচলিত হতেন না, তবে গভীর বেদনার ছায়া তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল। কেবলই বলছিলেন, তাঁর শেষ কাজে আমাকে যেতেই হবে। সাংবাদিকরা যখন তাঁকে কিছু বলতে বললেন, বাবা শেক্‌স্‌পিয়রের ভাষায় বললেন : **When comes such another?**

১৯৪৭-এর প্রথম থেকেই বাবা দেশের সব সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত নির্ভয়ে এবং খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করছিলেন। তাঁর মতামত দেশের অধিকাংশ নেতা বা দল গ্রহণ করেননি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বাবাকে লিখেছিলেন, তিনি যেন আবার কংগ্রেসের নেতৃত্বে ফিরে আসেন, যাতে তাঁরা সকলে মিলে দেশের ঐ সঙ্কট

সময়ে জটিল সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে পারেন। বাবা রাজি হননি, বলেছিলেন, গভীর নীতিগত পার্থক্য যখন রয়েছে তখন তাঁর পক্ষে বাইরে থাকাই ভাল।

বাবা বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য একটা পত্রিকা দরকার। পত্রিকা চালানোর ব্যাপারটা কিন্তু বাবার কাছে নতুন কিছু ছিল না। সেই বিশের দশকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন বাবা। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ঐ পত্রিকা চালিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব বাবাই বহন করেছিলেন। পরে রাজরোষে পড়ে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা যখন হঠাৎ বন্ধ করে দিতে হয়, বাবা ও রাঙাকাকাবাবু এক অসাধ্যসাধন করে বসেন। রাতারাতি 'ফরওয়ার্ড'-এর বদলে 'লিবার্টি' পত্রিকা বের হতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঐ দুটি পত্রিকার অবদান ভোলবার নয়। কিন্তু পত্রিকা বের করা ও চালিয়ে রাখা—অনেক খরচের ব্যাপার। 'ফরওয়ার্ড' ও 'লিবার্টি'-র ক্ষেত্রে বাবা আর্থিক দিক দিয়ে কোনো কার্পণ্য করেননি। কিন্তু বয়স তখন অনেক কম ছিল এবং টাকা রোজগার করবার সময় ও সুযোগ ছিল বেশি। তবে কাগজ বের করবার সিদ্ধান্ত তিনি যখন একবার নিয়েছেন, তিনি করে তবে ছাড়বেন। অর্থ সাহায্যের জন্য তিনি কোনো কোনো সচ্ছল বন্ধুর কাছে অনুরোধ করলেন। সাড়া আশাপ্রদ হল না। তখন নিজেরই জমিজমা এখানে-সেখানে যা ছিল সেগুলি ব্যবহার করে, তার সঙ্গে নিজের রোজগারের যতটা পারলেন যোগ দিয়ে, একটা প্রেসের ব্যবস্থা করলেন। জোর কদমে কাজ এগোল। টাকার যত অভাব ছিল, স্বার্থত্যাগী একনিষ্ঠ কর্মীর তত অভাব ছিল না। তাঁদের সকলের মিলিত চেষ্টায় ১৯৪৮-এর ১ সেপ্টেম্বর 'দি নেশন' কাগজ বেরোল। বাবা হলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। তাঁর সই করা সম্পাদকীয় প্রথম সংখ্যায় ছাপা হল। সম্পাদক হলেন সত্যরঞ্জন বক্সি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং বার্তা সম্পাদক মোহিতকুমার মৈত্র। 'দি নেশন' পত্রিকা বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করল। বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণের চাহিদা পত্রিকার কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি মেটাতেই পারছিলেন না। বাবা খুবই উৎসাহিত হলেন এবং পত্রিকাটি যাতে খুব উঁচু মানের হয় তার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। পরের বছর আমি যখন ডাক্তারিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে ছিলাম তখন 'দি নেশন'-এর ফরেন করেসপনডেণ্ট হিসাবে সাংবাদিকতায় এবং লেখালেখিতে আমার হাতেখড়ি হয়। বাবারই নির্দেশে প্যারিসে আমি 'দি নেশন'-এর প্রতিনিধি হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক সম্পাদক সম্মেলনে যোগ দিই।

যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পরেই বাবার কাছে ভিয়েনা থেকে এক বন্ধুর মারফত একটি চিঠি এসে পৌঁছয়। চিঠিটির সঙ্গে ছিল বাংলায় বাবাকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর একখানা চিঠির প্রতিলিপি। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউরোপ থেকে সাবমেরিনে পূর্ব-এশিয়া পাড়ি দেবার পূর্ব-মুহূর্তে রাঙাকাকাবাবু চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠিটিতে রাঙাকাকাবাবু তাঁর সহধর্মিণী ও কন্যা অনীতার কথা তাঁর মেজদাদাকে জানিয়েছিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপে গিয়ে কাকিমা ও অনীতার সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থাদি করার ইচ্ছা বাবার মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকেই তিনি মোটামুটি ঠিক করলেন যে যাবেনই। আমার ডাক্তারি পাশ করার পর প্রায় দেড় বছরের শিক্ষানবিশি ঐ বছরেই শেষ হবে। ঠিক হল শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি সঙ্গে যাব এবং দুই ছোট বোনকেও সঙ্গে নেওয়া হবে। (ক্রমশ)

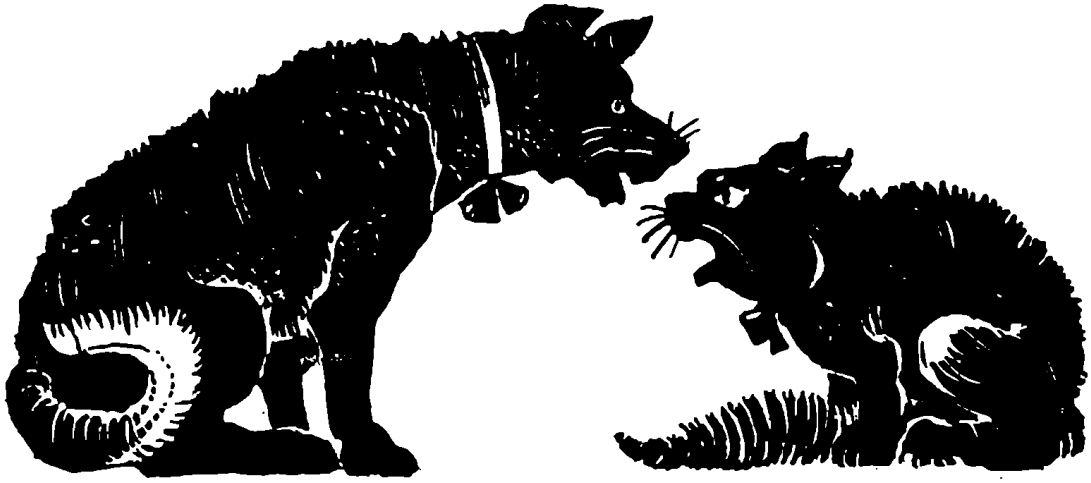

বাঘা আর বিবি

মুস্তাফা নাশাদ

বাঘাকে দেখলেই বিবির গা জ্বালা করে। রাগে, ঘেন্নায়, ক্ষোভে ! আর মনে পড়ে যায়, হারিয়ে যাওয়া সেই সব সুন্দর দিনের কথা। কোথায় যেন হঠাৎ হারিয়ে গেল সব।

সেই সব হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলির কথা বিবিকে আজও ভাবায়, হাসায় আবার কাঁদায়ও।

শত্তুর ! শত্তুর ! চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভাবে বিবি ! বাঘা ! হুঁঃ ! তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিবি ভাবে, কে রেখেছে ওর নাম বাঘা ? বাঘ না আস্ত একটা বাঁদর ! সব সময় দাঁত খিঁচোবে আর কামড়াবার জন্যে তাড়া করবে। দেখলেই আর রক্ষে নেই। দৌড়—দৌড়—দৌড়। তারপর : গিন্নিমা'র কাছে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে ছেড়ে বাঁচা।

গিন্নিমা'র কাছে বাঘা কেঁচো। তার কোনো চালাকিই খাটে না। দেখলেই তাড়া করেন। বিবির তখন কী আনন্দ ! গিন্নিমা'র কাছেই ঘুর-ঘুর করবে। পায়ে-পায়ে জড়াবে আর জিভ দিয়ে তার গা চেটে সোহাগ জানাবে।

গিন্নিমা'র মুখ চেয়েই সে এ-বাড়িতে এখনও পড়ে রয়েছে। তা না হলে কবে চলে যেত। এ-বাড়িতে তার আসাও ঐ গিন্নিমা'র জন্যই।

সেই... সেই যে-বছর গিন্নিমা তাঁর দামি জামা-কাপড়গুলো বার করলেন ভাদ্দর মাসের রোদ দেখাবেন বলে, আর বাক্স-প্যাঁটরা খুলে ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবার মতন হয়েছিলেন ; সেই—সেবারই ও প্রথম এ-বাড়িতে এসেছিল।

গিন্নিমা'র দামি জামা-কাপড়গুলো সব ইঁদুরে কেটে-কুটে ফর্দাফাঁই করে দিয়েছিল ! ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে দুধ-ভাত-মাছ খাইয়ে ওকে পুষতে শুরু করলেন। আর আদর করে ওর নাম দিলেন বিবি।

বিবি সেই তখন থেকেই এ বাড়িরই একজন। শুধু কি একজন ? না, তা নয়। বিবির মতোই সে বিবি ! সারা দিন ভালমন্দ এটা-সেটা খাওয়া। আয়েশ করে গদি-আঁটা বিছানায় ঘুমনো। আর চারদিকে আঁধার করে রাত্তির নামলেই ইঁদুরগুলোকে কচুকাটা করা। রুটিন-মাফিক কাজ। নিয়ম-মাফিক খাওয়া।

জীবনটা বেশ সুখেই কাটছিল। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। বাকি জীবনটাও দিব্যি কেটে যেত, যদি না

বাড়িতে ডাকাত পড়ত !

সে-বছর ফসল, এক কথায় খুব ভালই হয়েছিল। কত্তাবাবুর গোলাভরা ধান। গোয়ালভরা গোরু। পুকুরভরা মাছ। আর ফল-পাকুড়ের বাগান তো ছিলই। কানায়-কানায় সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি !

দুষ্টু লোকের চোখ টাটাত। কত্তাবাবুকে জব্দ করার জন্য ফন্দি-ফিকির আঁটত। কিন্তু, কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারত না কেউ। কত্তাবাবু ছিলেন খুব সাবধানী লোক। খুব হিসেব করে চলতেন। দেখে-দেখে পা ফেলতেন। এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও বাড়িতে ডাকাত পড়ল।

গ্রীষ্মকাল। গ্রামবাসীরা তখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে-যার দালানে, মাঠে-ঘাটে বসে ছিল। তাই খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। গোলা ভেঙে অবিশ্যি কিছু ধান লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ? তারপরেই কত্তাবাবু শহরে গিয়ে একটা দামি কুকুর কিনে এনে পুষতে শুরু করলেন। আদর করে তার নাম দিলেন, বাঘা।

চোর-ডাকাত দেখলেই বাঘা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরবে। টুঁ শব্দটি করারও সময় দেবে না ! আগে ছিল বিবি। এবার এল বাঘা। বাঘা আর বিবি। বিবি আর বাঘা। দু-জনই এ-বাড়ির পাকা বাসিন্দা। মিলে-মিশে থাকবে। যে যার কাজ করবে। কত্তা-গিন্নি তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু তা আর হল কোথায় !

সব সময় দুজনাতে খিটিমিটি লেগেই আছে। আবার ওদের খিটিমিটি মেটাতে গিয়ে কত্তা-গিন্নির মধ্যেও মাঝেমধ্যে খিটিমিটি লেগে যায়।

বিবি ছাড়া গিন্নির যেমন চলে না, তেমনি বাঘা ছাড়া কত্তার। কত্তার খাবার সময় বাঘার থাকা চাই-ই, আবার গিন্নির খাবার সময় বিবির। এই নিয়মেই বেশ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধ সাধল বিবি। সে মাঝে-মধ্যে কত্তার খাবার সময়ও এসে হাজির হত। বাঘার তা মোটেই সহ্য হয় না। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল। বিবি কোনো কথাই শুনবে না। তার যুক্তি হল, সে এ-বাড়িতে আগে এসেছে ; তার প্রাপ্যই বেশি। ছিটেফোঁটা যা থাকবে, তা পাবে বাঘা। আর তখন থেকেই দুজনার মধ্যে বন্ধুত্বের ছেদ ঘটল।

সেদিন কত্তার নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাড়িতে ভালমন্দ রান্না হয়েছে। কত্তা দালানে খেতে বসেছেন। তাঁর সামনে বিভিন্ন বাটিতে নানা রকমের রান্না মাছ, মাংস, ডিম, ডালনা—আরও কত কী। বাটিগুলো থেকে দারুণ গন্ধ বেরুচ্ছে। সামনে বসে কেমন লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছে বাঘা। খুব আস্তে-আস্তে ঘৌ-ঘৌ-ঘোঁ-ঘোঁ করছে আর লেজ নাড়ছে। ব্যস, আর যায় কোথায়। বিবি তাই দেখে টিপ্পনি কাটল—

এ বলে ছি !
ও বলে ছি !
বসে রয়েছে—
ঠাকুরঝি !

বিবি তাকে হেয় করছে দেখে রাগে বাঘার শরীর রি-রি করে উঠল। বড্ড বেড়ে গিয়েছে। নাঃ, মুখ বুজে আর সওয়া যায় না। ওকে মুখের মতো জবাব একটা দিতেই হবে। সেও মুখ-ঝামটা দিয়ে বলল—

চোখ কেন তোর টাটায় ?
জ্বলেপুড়ে মরবি শেষে—
হিংসা-আগুন ভাঁটায় !

কেমন ? মুখের মতো জবাব হল তো ? বাঘা আনন্দে ঘৌ-ঘৌ করে বার দুয়েক লেজ নাড়ল। বিবি, অর্থাৎ বাঘের মাসি ! সহজে দমবার পাত্রী নয় সে। কোথাকার একটা কুকুর, তার কাছে নতি স্বীকার ? ছোঃ ! ছোঃ ! বিবি প্রায় ধমকের সুরে বলল—

থাম-থাম-থাম
বিধি হলে বাম,
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ—
পুছবে না কেউ !

আর যায় কোথায় ? একেবারে আঁতে ঘা

দিয়েছে বিবি। কী ভাবে ও নিজেকে ? ওর মতো নাকি ? হ্যাংলা ! চোরের মায়ের বড় গলা ! রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বাঘা বলল—

রাত জেগে দি চৌকি !
এমনি খেতে ভালমন্দ—
দিচ্ছে বলো বউ কি ?

এ-যুক্তি খণ্ডানো বিবির বোনপোর পক্ষেও অসাধ্য ! মনে মনে ভাবে বাঘা। কেমন মুখের মতো জবাব দিলুম তো ? সবাইকে নিজের মতো ভাবে। একবার রাত জেগে পাহারা দিয়ে দেখ না, 'কী ঠেলা ; কত ঝক্কি ! শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই—সদাই সজাগ। তোর মতো কি ভাল-মন্দ খাচ্ছি আর গদিতে বসে ঘুমোচ্ছি।

বিবি কিন্তু বাঘার কথা শুনে মোটেই দমল না। বরং সে কাটা ঘায়ে আর একটু নুন ছিটিয়ে দিয়ে বলল—

এঁটোকাঁটা দেয় ছুঁড়ে সব
তাই পেয়ে তুই ধন্য।
মাছ-মাংস খাই রে আমি
তোর মতো নই বন্য !

নাঃ ! আর সহ্য করা যায় না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে ! রাগে গর্‌র্-গর্‌র্ করতে-করতে বিবিকে ধরার জন্য ঘৌ করে মারল এক লাফ। কিন্তু লাফানোই সার, বিবি বিপদের আঁচ পেয়ে আগেই সরে পড়েছে।

পরের দিন, এক অভাবনীয় কাণ্ড দেখে বাঘা প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর মুখ থেকে কোনো কথাই সরে না। সে হাসবে না কাঁদবে ? কিছুই ঠিক করতে পারে না। যতই খিটিমিটি হোক, তাহলেও ওর সঙ্গী, বন্ধু। ঝগড়াঝাটি হয়েছে, তবে সবই সাময়িক। আবার দু'জনায় ভাবও হয়েছে। কিন্তু আজ এ কী দেখছে সে ? সবই বিধির বিধান। না হলে এমনটা ঘটবেই বা কেন ? খড়ের ছড়া দিয়ে বিবির গলাটা ভালভাবে বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছেন কত্তাবাবু। আর বিড়-বিড় করে বলছেন—

স্বভাব যায় না ম'লে
কয়লা কি হয় সাফ রে—
ময়লা যায় না ধুলে !

কত ভাল-মন্দ খেতে দিতাম। কত ভাল বাসতাম। তাও হতচ্ছাড়াটার রোজ রাত্তির হলেই চোরের মতো চুপি-চুপি জানলা গলে এসে টেবিলে রাখা দুধটুকু খেয়ে যাওয়া চাই-ই !

কত্তাবাবু গজরাতে-গজরাতে চললেন। বাঘা আসল ঘটনাটা জানার জন্য উৎসুক হয়ে বলল—

রাতের বেলা খুব তো মাসি
কথার ফোটে খৈ !
খড়ের মালা গলায় পরে
চললে কোথায় সই ?

বাঘার কথা শুনে লজ্জায় বিবির মুখ লাল হয়ে গেল। বাঘার দিকে তাকাতে গিয়েও পারল না। মাথাটা কেমন যেন ভারী ভারী মনে হল। হাত-পা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে !

সে আজ অনুতপ্ত। লজ্জিতও। যে বাড়িতে অ্যাদ্দিন সে মাথা উঁচু করে ছিল, আজ সেই বাড়ি থেকেই তাকে চলে যেতে হচ্ছে মাথা নিচু করে। এর চেয়ে বড় অসম্মানের আর কী হতে পারে ? এই তো তার চরম শাস্তি ! এর পর আর কী বাকি থাকে ? ভাবতে গিয়ে বুকের কোথায় যেন কী একটা চিন-চিন করে উঠল। চোখের কোণে চিক-চিক করে উঠল কয়েক ফোঁটা জল। বিবি তবু ধরে আসা গলায় অতি কষ্টে তার ফুসফুসের সমস্ত বাতাস এক জায়গায় জড়ো করে মিঁ-মিঁ করে বলল—

মাছ-মাংস খুব খেয়েছি
আর মানে না মন।
খড়ের মালা গলায় পরে
যাচ্ছি বৃন্দাবন !

বাঘা কী বুঝল, কে জানে। তবে সে আর সেখানে দাঁড়াল না। ধীর পায়ে সেখান থেকে চলে গেল। বাড়ির দিকে নয়, বনের দিকে !

টারজান
চ্যাঙ্গো, এবারে তুমি মরবে !
মেজর মটালা তো ওইদিকেই !
বিস্ফোরণের শব্দে পুলিশ আমাদের হদিস পেয়ে যাবে !
ওরা পালাচ্ছে ! বাঁচা গেল !
কিন্তু...
চ্যাঙ্গোর গ্রেনেডই তোমাকে মারত মটালা ! তার বদলে
এই ঘুসিটা তোমার পাওনা ছিল !
টারজান, ওর গুলি কিন্তু আমাকে জখম করেছে !
তার চিকিৎসা হবে ! এসো !
দেখলে তো, সবাই মিলে বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় !
আগামী সংখ্যায় : নতুন অ্যাডভেঞ্চার

রোভার্সের রয়
রোভার্স প্যাকোকে কিনেছে। তবে রোভার্সের নিজের মাঠে ফরাসি টিম সরবনের বিরুদ্ধে উয়েফা কাপের সেমিফাইনালে প্যাকো খেলছে না। রোভার্স ২—০ গোলে জিতছে।
উঃ, ফরাসি ব্যূহ একেবারে ভাঙছে!
তৃতীয় গোল চাই!
মার্ভিন এগোচ্ছে!
মার্ভিন এ কী করল?
এমন সুযোগ নষ্ট করল?
রয়, আজ বড্ড মানসিক চাপ যাচ্ছে মার্ভিনের!
তার কারণ প্যাকো!
গ্যালারিতে বসে প্যাকো খেলা দেখছে!
প্যাকো ওর জায়গা কেড়ে নেবে, এই হচ্ছে মার্ভিনের ভয়!
পাল্টা-খেলায় দু'গোলের ব্যবধান মুছে যাওয়া বিচিত্র নয়!
গোল চাই!
ভার্ননকে বল দিয়েছে রয়!
ভার্নন সে-বল রয়কেই ফেরত পাঠাল!
উঃ, দারুণ পাস!
নাও, রয়!

কিন্তু হঠাৎ ছুটে এল মার্ভিন !
এ কী !
রয়ের বদলে মার্ভিন হেড করল কেন ?
আবার সুযোগ নষ্ট !
সুযোগ কিন্তু নষ্ট হল না—
বল গোলে ঢুকেছে !
যাঃ !
রয় ! রয় ?
খেলা শেষ হবার পর...
কার হেড থেকে গোল হল রয় ? তোমার ?
না, মার্ভিনের চুল ছুঁয়ে গেছে !
গোলটা অতএব ওর নামেই লেখা হবে !
মাট্টি !
গোলটা সত্যি ওর পাওনা ছিল না !
ওকে নিয়ে কী যে করি !
ফিরতি-সেমিফাইনাল ড্র। ফলে রোভার্স ফাইনালে গেল। পরে— রোভার্সের খেলোয়াড়রা টিভিতে দেখছে উয়েফার অন্য সেমিফাইনালে জার্মান টিম রাসবুর্গের দাপট—
রাসবুর্গই ফাইনালে উঠবে !
অর্থাৎ ফাইনালে আমরা ওদের সঙ্গে খেলব !
জেতা শক্ত হবে !
আরও শক্ত হবে যদি না মার্ভিনের মেজাজ ঠাণ্ডা হয় !
ঠিক বলেছ !
সমস্যাটা নিয়ে স্ত্রী পেনির সঙ্গে আলোচনা করছে রয়...
মার্ভিনকে কি বসিয়ে দেব ?
বিপক্ষ তাহলে টের পেয়ে যাবে যে, রোভার্সের মধ্যে গোলমাল আছে।
বিপক্ষের মনোবল তাহলে বাড়বে। ঠিক।
জার্মানির পথে রোভার্স দল—
আরে, পাকো সঙ্গে যাচ্ছে ! মার্ভিনকেও দেখছি !
মার্ভিনকে না-বসানোই ভাল।
ভাঙা-মন নিয়ে কেমন খেলবে মার্ভিন ?
(এ পর্ব আগামী সংখ্যায়)

চুপি চুপি সিন্ধুঘোটককে নিয়ে সরে পড়ে সে।
ভোর হতে এখনও দু-তিন ঘড়ি বাকি, এর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে !
তারপর গাঁয়ের বাইরে এসে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়···
বেলা বাড়ে···
ইশ্ ! সুয্যি যে মাথার ওপর উঠে গেছে ! হায়দার মিঞা, ওঠো ওঠো, এবার রওনা হতে হয় !
আরেকটু গড়িয়ে নিই, রোসো। রাতের খাওয়াটা বড্ড চাপ হয়ে গেছে।
যত জোরে পারিস ছুটে চল্ বাবা !

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাশ

জনপদ ছেড়ে আবার পাহাড় শুরু হয়েছে। সিন্ধুঘোটক ছুটে চলে।

এদিকে ধড়াচুড়ো পরে শোভান মিঞা আর হায়দার মিঞা সদাশিবের খোঁজ করতে এসে দেখে…

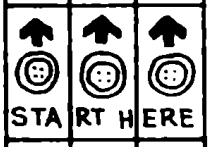

START HERE
25 PAISE
'কে প্রথম কানাড়া ব্যাংক কাউন্টার ছুঁতে পারে?'
কে প্রথম কানাড়া ব্যাংক কাউন্টার ছুঁতে পারে? তিনজন খেলোয়াড়ের খেলা—সহজ অথচ উত্তেজনাপূর্ণ। তোমাদের শুধু দরকার কিছু খুচরো পয়সা — ৪টি হলেই ঠিক; তাছাড়া ৩টি বোতাম। নিয়মাবলীর জন্যে সংলগ্ন পাতাটি দেখো।
কানাড়া ব্যাংক
(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)
কাদা পচপচ

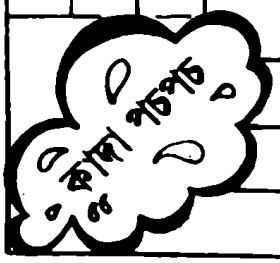

‘কে প্রথম কানাড়া ব্যাংক কাউন্টার ছুঁতে পারে?’ খেলার নিয়মাবলী

১. সুরুতে, প্রতিটি খেলোয়াড়কে পরপর ৪টি পয়সা ছুঁড়তে হবে। খেলোয়াড়দের এগিয়ে যেতে হবে হেড-এর সংখ্যা অনুযায়ী—যথা, একটি হেড—এক ধাপ দুটি হেড—দুই ধাপ, তিনটি হেড—তিন ধাপ, চারটি হেড—চার ধাপ।

২. যখনই কোনো খেলোয়াড় ৪টি হেড একসঙ্গে আনতে পারবে সে আর একবার খেলার সুযোগ পাবে।

৩. খেলোয়াড়দের তিনবার নির্দিষ্ট পথে যাওয়া আসা করতে হবে কাউন্টারের গলিতে ঢোকার আগে।

৪. খানা ডোবায় প'ড়ে গেলে একটা দান নষ্ট।

৫. ঝোপে আটকে গেলে দুটি দান নষ্ট।

৬. পাহাড়ে উঠলে একটা দান লাভ।

মেধাবী ছাত্রদের জন্যে অপূর্ব সুযোগ
হও মেধাবী ছাত্র! হও উচ্চাকাঙ্ক্ষী!
মনে রেখো — তোমাদের মত মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে টাকা ধার দেয়—কানাড়া ব্যাংক।

বিনামূল্যে! কানাড়া ব্যাংক-এর স্টিকার

নিয়ে এস কানাড়া ব্যাংক-এর সেই শাখা থেকে যেখানে তোমার বালক্ষেম বা মাইনর অ্যাকাউন্ট আছে।

তুমি নাবালক। তাতে কি হয়েছে?

তোমার মা-বাবাকে বলো—তোমার নামে কানাড়া ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে। তুমি যদি ১৪ বছরের হও তাহলে নিজেই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে ও লেনদেনও চালিয়ে যেতে পারবে। চলে এস, তোমার মধ্যে শিহরণ জগাও। আজই চালু কর—মাত্র ৫ টাকা দিয়ে।

বিদ্যানিধি

তুমি কি হ'তে চাও? ডাক্তার? ইঞ্জিনিয়ার? বৈজ্ঞানিক? তাহলে তার ব্যবস্থা করে দেবে—বিদ্যানিধি। মা-বাবাকে বলো আজই একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে। তোমার উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে আর কোনো চিন্তাই থাকবে না।

বালক্ষেম

চালাক ছেলেমেয়েরা হাত-খরচার পয়সা পুরোটাই ব্যয় করেনা। কানাড়া ব্যাংকের টি. ভি. বাক্সে কিছু কিছু জমায়। তুমিও তাই করো। মা-বাবাকে বলো—কানাড়া ব্যাংকে একটা বালক্ষেম অ্যাকাউন্ট খুলতে। টি. ভি. বাক্সে খুচরো পয়সা ফেলতে থাকো; দেখবে—তোমার সঞ্চয় কেমন বেড়ে উঠছে! তোমার স্বপ্ন সফল হচ্ছে!

কানাড়া ব্যাংক
(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)

maa(s) CB-8 Ben d 82

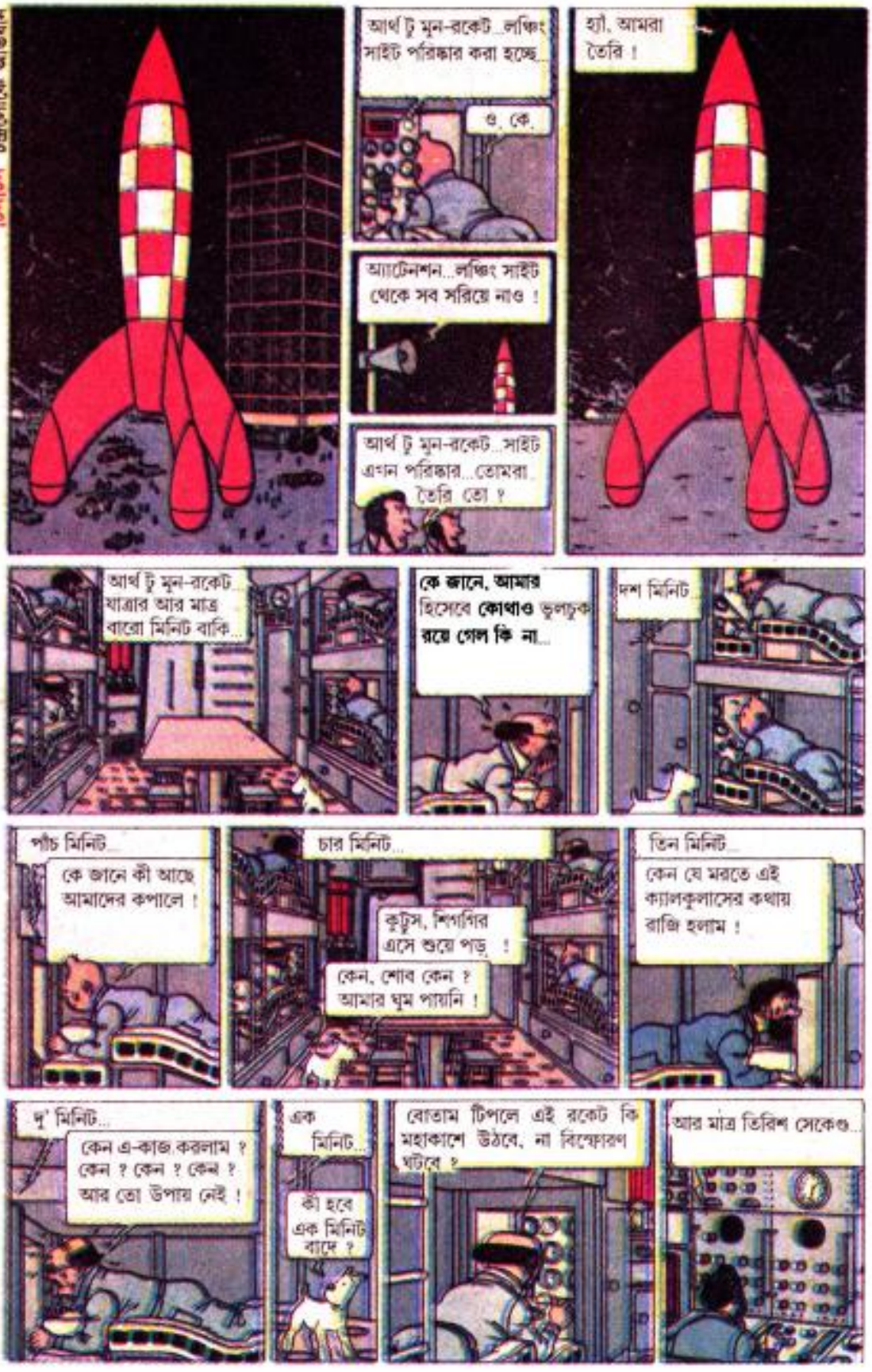
আর্থ টু মুন-রকেট...লঞ্চিং সাইট পরিষ্কার করা হচ্ছে...
ও. কে.
অ্যাটেনশন...লঞ্চিং সাইট থেকে সব সরিয়ে নাও !
আর্থ টু মুন-রকেট...সাইট এখন পরিষ্কার...তোমরা তৈরি তো ?
হ্যাঁ, আমরা তৈরি !
আর্থ টু মুন-রকেট...যাত্রার আর মাত্র বারো মিনিট বাকি...
কে জানে, আমার হিসেবে কোথাও ভুলচুক রয়ে গেল কি না...
দশ মিনিট...
পাঁচ মিনিট...
কে জানে কী আছে আমাদের কপালে !
চার মিনিট...
কুটুস, শিগগির এসে শুয়ে পড় !
কেন, শোব কেন ? আমার ঘুম পায়নি !
তিন মিনিট...
কেন যে মরতে এই ক্যালকুলাসের কথায় রাজি হলাম !
দু' মিনিট...
কেন এ-কাজ করলাম ? কেন ? কেন ? কেন ? আর তো উপায় নেই !
এক মিনিট...
কী হবে এক মিনিট বাদে ?
বোতাম টিপলে এই রকেট কি মহাকাশে উঠবে, না বিস্ফোরণ ঘটবে ?
আর মাত্র তিরিশ সেকেণ্ড...

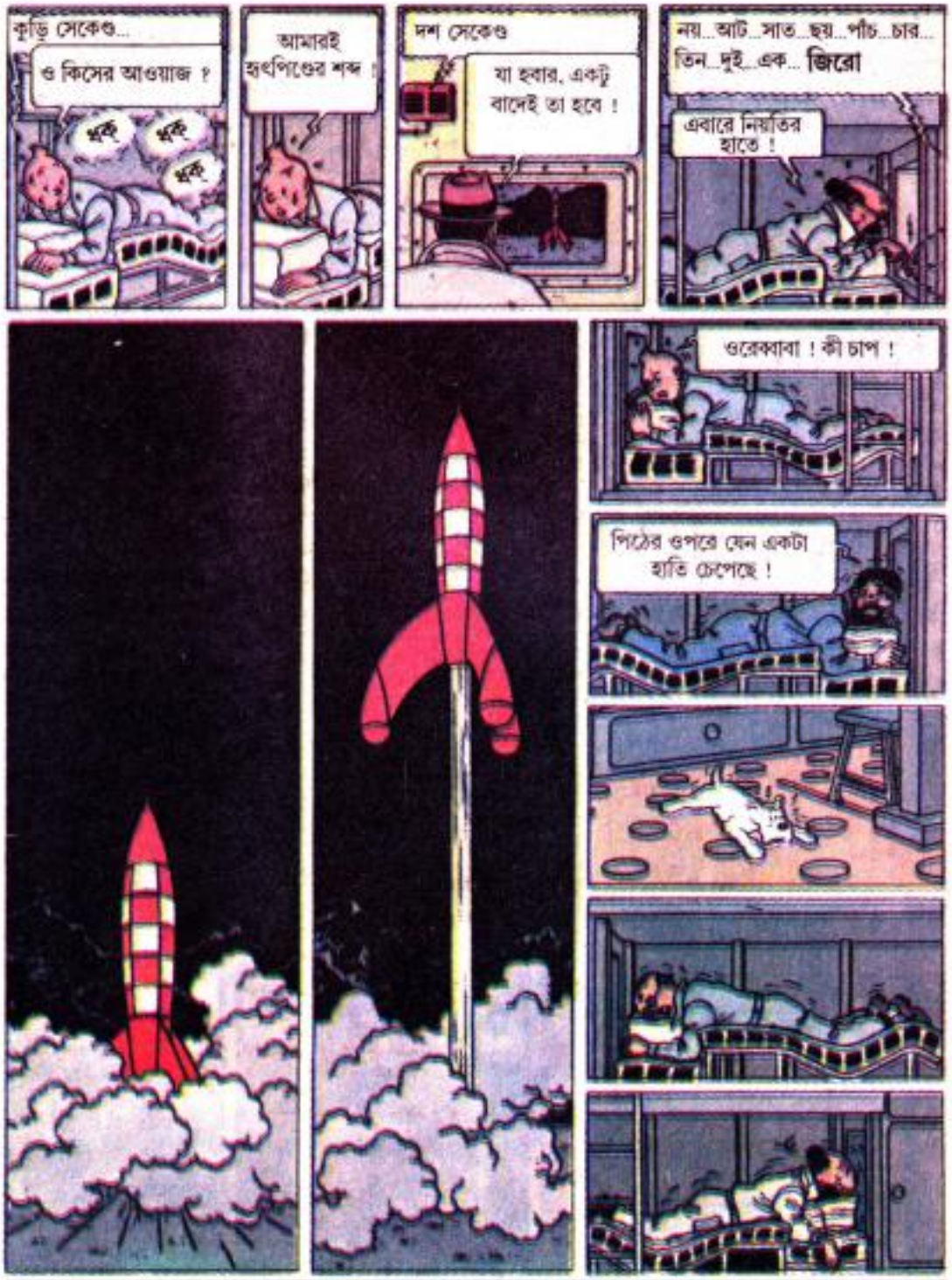

রকেট তো মহাকাশে উঠল
কিন্তু
কী আছে তার যাত্রীদের কপালে ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বিমল মিত্র

এবং

তিনটি আশ্চর্য উপন্যাস

এক রাজা ঠিক করলেন যে, তাঁর দুই ছেলের মধ্যে পৃথিবীর সব-থেকে বোকা লোকটিকে যে খুঁজে বার করতে পারবে, তাকেই তিনি বসাবেন তাঁর সিংহাসনে। দুই ছেলে ছুটল—এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। তারপর ? তারপরে যে-কী, তা জানতে গেলে পড়তে হবে বিমল মিত্রের 'রাজা হওয়ার ঝকমারি'। দারুণ কৌতূহলকর এই বইটি ছাড়াও তাঁর আরেকটি উপন্যাস 'দাশরথির বাহাদুরি'। এই উপন্যাসে তিনি শুনিয়েছেন একটি ছেলের মাতৃভক্তি আর ঈশ্বরভক্তিতে অটল থেকে বড়ো হবার এক অসাধারণ কাহিনী। সেই ছেলেটির নাম দাশরথি। 'দাশরথির বাহাদুরি' শুধু গল্পেরই ক্ষিদে মেটাবে না, অনুপ্রাণিতও করবে তোমাদের। সব নতুন বই 'কে ?'

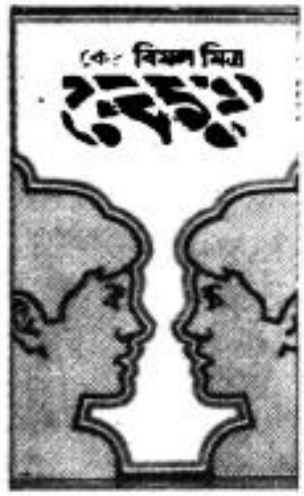

বিমল মিত্রের বই

রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮·০০ দাশরথির বাহাদুরি ৮·০০ কে ? ১৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সকালবেলা পার্কে কারা যেন কাকাবাবুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। কাকাবাবু প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীরে পক্ষাঘাতের মতন হয়ে গেল। স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হল ত্রিপুরায়। সেখানে নানারকম উপদ্রব হতে লাগল। তারপর এক রাতে একদল মুখোশধারী এসে সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গেল জোর করে। একটা নির্জন বাড়িতে ওদের বন্দী করে রাজকুমার নামে একজন লোক কাকাবাবুর ওপর অত্যাচার করতে লাগল, তাঁর কাছ থেকে জঙ্গলগড়ের খবর জানবার জন্য। এমন সময় কাকাবাবুর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মা পুলিশ নিয়ে এসে পড়ায় পালিয়ে গেল ওরা। সঙ্গে নিয়ে গেল সন্তুকে। এবারে আরও অনেক দূরে একটা টিলার ওপর পাথরের বাড়িতে ওরা লুকিয়ে রইল। তারপর—

॥ ২০ ॥

ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজকুমার 'মেজর'-কে বলল, "যাও, জলদি কাগজ আর কলম নিয়ে এসো !"

'মেজর' যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বড়-বড় করে বলল, "কাগজ ? কলম ? সে আমি পাব কোথায় ?"

রাজকুমার বিরক্ত হয়ে বলল, "কেন, তোমার কাছে কাগজ-কলম নেই ? যোগাড় করে রাখোনি কেন ?"

মেজর হে-হে করে হেসে বলল, "কী যে বলেন, রাজকুমার ! আমরা যে-কাজ করি, তাতে কি কখনও কলমের দরকার হয় ? আপনি আগে তো যোগাড় করে রাখার কথা বলেও যাননি !"

রাজকুমার তখন দরজার কাছে দাঁড়ানো 'কর্নেল' আর অন্য দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কারুর কাছে কলম আছে ?"

কর্নেল কোনো উত্তর দেবার বদলে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। যেন কলম কথাটি সে আগে কখনও শোনেইনি। অন্যরাও কেউ কোনো কথা বলল না।

রাজকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে 'মেজর'-কে বলল, "তুমি অন্য ঘরগুলিতে খুঁজে দেখে এসো !"

মেজর বলল, "আমি তিনদিন ধরে এ-বাড়িতে আছি। সব ঘর ঘুরে দেখেছি। এক টুকরো কাগজও দেখিনি, কলমও দেখিনি !"

রাজকুমার নিজের বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মেরে বলল, "সামান্য কাগজকলমের জন্য সময় নষ্ট করতে হবে ? এখন সময়ের দাম জানো ? যা হোক, একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে কালকের মধ্যে ! একটা চিঠি লেখার ব্যবস্থা রাখতে পারোনি ?"

মেজর বলল, "পাশের ঘরে একটা পুরনো ক্যালেণ্ডার আছে, তার একটা পাতা ছিঁড়ে উল্টোপিঠে লেখা যেতে পারে। কিন্তু কলম কোথায় পাওয়া যাবে ?"

কর্নেল বলল, "আমি গাছের ডাল কেটে কলম বানিয়ে দিতে পারি।"

এই বলে সে কোটের পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বার করল।

রাজকুমার ভেংচিয়ে বলল, "গাছের ডাল কেটে কলম বানালেই চলবে ? শুধু কলম দিয়ে লেখা যায় ? কালি কোথায় পাওয়া যাবে ?"

কর্নেল বলল, "কাঠকয়লা নেই বাড়িতে ? কাঠকয়লা গুঁড়ো করে কালি

বানানো যায়।"

রাজকুমার এবার একটা হুংকার দিয়ে বলল, "তবে যাও! শিগগির কালি আর কলম বানিয়ে নিয়ে এসো!"

মেজর আর কর্নেল দৌড়ে বেরিয়ে গেল। রাজকুমার দুই কোমরে হাত দিয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইল সন্তুর দিকে।

সন্তুর বেশ মজা লাগছে। এতগুলো লোক, কারুর কাছে একটা ডট্ পেন পর্যন্ত নেই। এই যে রাজকুমার এত চ্যাঁচামেচি করছে, সে-ও তো খুব সেজেগুজে রয়েছে, সে-ও পকেটে একটা কলম রাখে না? এতেই বোঝা যায়, এরা কী রকম ধরনের মানুষ!

রাজকুমার এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকের জানলাটা খুলে দিল। তারপর জানলার শিকগুলো টেনে টেনে দেখল, সেগুলো ঠিক শক্ত আছে কি না।

সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তোমার কথা আমি জানি। নেপালে আর আন্দামানে তুমি অনেক রকম খেল্ দেখিয়েছ! এখানে যেন সে রকম কিছু করতে যেও না। এটা শক্ত ঠাঁই!"

সন্তু কোনো উত্তর দিল না। এই রাজকুমারকে গোড়া থেকেই তার খুব গোঁয়ার বলে মনে হয়েছে। এই রকম লোকের পক্ষে ফট্ করে গুলি চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু না।

একটু বাদেই মেজর আর কর্নেল ফিরে এল। একটা চায়ের কাপে কালি গুলে এনেছে, আর গাছের ডাল কেটে একটা কলমও বানিয়েছে। মেজর নিয়ে এসেছে পুরনো ক্যালেণ্ডারটা।

তার একটা পাতা ছিঁড়ে সন্তুর সামনে ফেলে দিয়ে রাজকুমার বলল, "নাও, এবারে লেখো!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকে লিখতে হবে? প্রধানমন্ত্রীকে?"

রাজকুমার চোখ পাকিয়ে বলল, "ইয়ার্কি হচ্ছে? তোমার কাকাবাবুকে চিঠি লেখো। আমি যা বলছি, তাই লিখবে!"

সন্তু প্রথমে লিখল, পূজনীয় কাকাবাবু। তারপর রাজকুমারের মুখের দিকে তাকাল।

রাজকুমার বলল, "লেখো, আমি বেশ ভাল আছি।"

সেই ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ার সময় সন্তু ডিকটেশান লিখেছে, তারপর আর কারুর কথা শুনে শুনে তাকে চিঠি লিখতে হয়নি। যাই হোক, রাজকুমারের এই কথাটায় আপত্তির কিছু নেই বলে সে লিখে ফেলল।

রাজকুমার বলল, "তারপর লেখো, এখনও পর্যন্ত ইহারা আমার উপর কোনো অত্যাচার করে নাই!"

সন্তু বলল, "আমি সাধু ভাষা লিখি না। আমি চলতি ভাষায় চিঠি লিখি।"

রাজকুমার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "যা বলছি, তাই লেখো!"

সন্তু লিখল, "এখনও পর্যন্ত এরা আমার ওপর কোনো অত্যাচার করেনি।"

কর্নেল মেজর ও অন্য দু'জন সন্তুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখছে সন্তুর চিঠি লেখা।

রাজকুমার বলল, "হয়েছে? এবারে লেখো, তবে, আপনার উপরই আমার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের সন্ধান ইহাদের না দিলে ইহারা আর আমায় জীবন্ত ফিরিয়া যাইতে দিবে না!"

সন্তু বলল, "একথা আমি লিখব না!"

রাজকুমার বলল, "লিখব না মানে? তোর ঘাড় ধরে লেখাব। হতচ্ছাড়া, যা বলছি তাই লেখ্ শিগগির!"

সন্তু বলল, "আমায় দিয়ে জোর করে কেউ কিছু লেখাতে পারবে না।"

রাজকুমার বলল, "তবে রে? আচ্ছা, দ্যাখ একটুখানি নমুনা। কর্নেল, ওর বাঁ হাতে একটু অপারেশন করে দাও তো!"

কর্নেল অমনি খপ্ করে সন্তুর বাঁ হাতটা চেপে ধরে টেনে নিল নিজের কাছে। তারপর তার ছুরিটা সন্তুর কনুইয়ের খানিকটা নীচে একবার ছুঁইয়ে দিল শুধু। মনে হল ঠিক যেন পালক বুলিয়ে গেল একটা। তবু সেই জায়গাটায় একটা লম্বা রেখায় ফুটে উঠল রক্ত। টপ্ করে এক ফোঁটা রক্ত পড়ল ক্যালেণ্ডারের পাতাটার উপর।

রাজকুমার নিষ্ঠুরভাবে হেসে বলল, 'এইবার দেখলি? লেখ্ যে, এই রক্তের ফোঁটাটা আমার। কাকাবাবু, আপনি আমার কথা না শুনিলে ইহারা আমার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবে। তারপর সেই রক্তে আমার জামা কাপড় চুবাইয়া তাহা আপনার নিকট পাঠাইবে।"

সন্তু বলল, "এরকম বিচ্ছিরি ভাষা আমি কিছুতেই লিখব না। আমাকে মেরে ফেললেও না।"

রাজকুমার পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে উল্টো করে ধরল। ওর বাঁট দিয়ে সন্তুর মাথায় মারতে চায়।

কিন্তু সে মারবার আগেই মেজর হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, "রাজকুমার, একটা কথা বলব? আমি একটু একটু লেখাপড়া করেছি। গুম-খুনের কিছু বইও পড়েছি। এই রকম সময় কী রকম চিঠি লিখতে হয়, তা খানিকটা জানি। আমি ওকে বলে দেব?"

রাজকুমার বলল, "তুমি কী রকম লেখাতে চাও, শুনি!"

মেজর বলল, "যেটুকু লেখা হয়েছে,

তারপর লিখুক, কাকাবাবু, আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের জায়গাটার একটা নকশা এঁকে যদি এদের কাছে পাঠান, তবেই এরা আমাকে ছাড়বে বলেছে। তবে এ সম্পর্কে আপনি যা ভাল বুঝবেন, তা-ই করবেন। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি।"

সন্তুর দিকে ফিরে মেজর বলল, "দ্যাখো ভাই, চিঠি তো তোমায় একটা লিখতেই হবে। নইলে আমরা তোমায় ছাড়ব না। শুধু শুধু কেন মারধোর খাবে ? আমি যা বললুম, তা লিখতে তোমার কি আপত্তি আছে ?"

কথা বলতে বলতে সকলের অলক্ষিতে মেজর সন্তুর দিকে একবার চোখ টিপে দিল। যেন সে বলতে চাইল, এই কথাগুলো লিখতে রাজি হয়ে যাও, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

গাছের ডালের কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে সন্তু লিখে দিল এই কথাগুলো।

রাজকুমার কাগজটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, "রায়চৌধুরী তোমার এই হাতের লেখা দেখে চিনতে পারবে ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, আমার সই দেখে ঠিক চিনবেন।"

রাজকুমার বলল, "পুনশ্চ দিয়ে আবার লেখো, ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর চাই।"

সন্তু বলল, "আর আমি কিছু লিখতে পারব না।"

মেজর বলল, "দিন। সেটা আমি লিখে দিচ্ছি। আমার হাতের লেখা কেউ চিনতে পারবে না। আমি সাত-আট রকম ভাবে লিখতে পারি।"

মেজর সন্তুর চিঠির নীচে লিখল, "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর আর নকশা না পেলে সব শেষ। তোমার ভাইপোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুলিশে খবর দিলে কোনো লাভ হবে না।"

এর নীচে সে আবার একটা মড়ার মাথার খুলি এঁকে দিল।

রাজকুমার আবার চিঠিখানা নিয়ে একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল, তারপর বলল, "ঠিক আছে। এটাই পাঠিয়ে দাও ! কর্নেল, তোমার একজন লোককে বলো ঘোড়া নিয়ে আগরতলায় চলে যেতে, ভোরের আগেই যেন পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জেনারেলই চিঠি ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করবেন !"

কর্নেল বলল, "কিন্তু আমার লোক যদি রাস্তায় ধরা পড়ে যায় ?"

রাজকুমার হুংকার দিয়ে বলল, "কে ধরবে ? কেউ ধরবে না, যাও ! ধরা পড়লেও চিঠি পৌঁছে যাবে ঠিক জায়গায়। আর যে ধরা পড়বে, তাকে আমি একদিন ধরেই ছাড়িয়ে আনব। আমি রাজকুমার, ভুলে যেও না !"

এরপর রাজকুমার সদলবলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সন্তুকে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। সন্তু আর সে দরজা টানাটানির চেষ্টা করল না।

সে এসে দাঁড়াল খোলা জানলার ধারে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গেটের কাছে ঘোড়ার খুর ঠোকার আর বড় বড় নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে একঝাঁক জোনাকি। টি-ট্টি টি-ট্টি করে দূরে একটা রাতপাখি ডাকছে। এরই মধ্যে কপাকপ্ শব্দ তুলে একটা ঘোড়া ছুটে চলে গেল।

যদিও কাছেই বিছানা পাতা, কিন্তু সন্তু বসে পড়ল ঐ জানলার পাশেই। তারপর জানলার শিকে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। সকাল হয়ে রোদ এসে তার মুখে পড়তেও তার ঘুম ভাঙল না।

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতেই সন্তু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট চেঙ্গিস

রথীন্দ্র সেনগুপ্ত

জানিস, আমার নাম চেঙ্গিস খাঁ !
দেখি কত হিম্মত, আয় লড়ে যা।
সত্যি বলছি আর বাড়াসনে পা,
মরে যাবি—এই দ্যাখ খুরপি ও দা।

এইসব হাতে পেলে হাত খুলে যায়—
এন্‌তার কোপ খেয়ে শুয়ে কাতরায়
রোজ রোজ বাগানের লতাপাতা মায়
শ'য়ে শ'য়ে ফুলগাছ—মাটিতে লুটায়।

নাম শুনে ভাবছিস বড় সেকেলে ?
কাউকে ছাড়ি না আমি বাগেতে পেলে।
ম্যানড্রেক, ওয়াকার ?—ফুঃ, এলেবেলে ;
টের পাবে শর্মার কাছেতে এলে।

ক্লাস টু-তে পড়ি বলে ভাবছিস তুই
পারব না। জানিস কি কাঁটাওলা রুই
নিজে নিজে খেতে পারি, রাতে একা শুই,
সঙ্গীবিহীন ঘুরি বিদেশ-বিভুঁই ?

হাতখানা দেখছিস—পেটা লোহাটি ?
ঘনাদার গুল নয়। সত্যি খাঁটি,
রাম সিং এই হাতে খেয়েই চাঁটি
উড়ে গিয়ে পড়েছিল বদ্যিবাটী।

এই ম'ল, বাবা এল, পেয়ে গেছে টের !
তদন্ত হবে বুঝি ফুলবাগানের ?
নটকান দিই রেখে খুরপি ও দা,
কাল এসে শুনে যাস বাদবাকিটা।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

সম্পূর্ণ উপন্যাস

মৃত্যুর টিকিট

আনন্দ বাগচী

পলক ফেলারও সময় দিল না, দুচোখে কেউ যেন আচমকা আলকাতরা ছুড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দ আর শহর অন্ধ। অন্ধকার। লোড-শেডিং। সুনন্দ আর টাল সামলাতে পারল না, একটা ধাক্কা খেয়ে পায়ে পা বেধে পড়ে গেল। পড়ে যেতে যেতে টের পেল, তার গা ঘষটে ঝড়ের মতো কিছু বেরিয়ে গেল। গোরু কিংবা কুকুরের পাল অনেক সময় এরকম ঝড় তুলে ছুটে যায়। প্রথমে তাই ভেবেছিল, কিন্তু না, পরের মুহূর্তেই টের পেল ওরা মানুষ। চার-পাঁচ জন হবে। সুনন্দর পেছন থেকে ছুটে এসে সামনের দিকে চলে গেল।

ব্যাপারটা কী তা বুঝতে পারার আগেই গোটা-দুই চোখ ঝলসানো ফ্ল্যাশ দিল, তারপরই গায়ে-গায়ে সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। মাটি কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বোমা

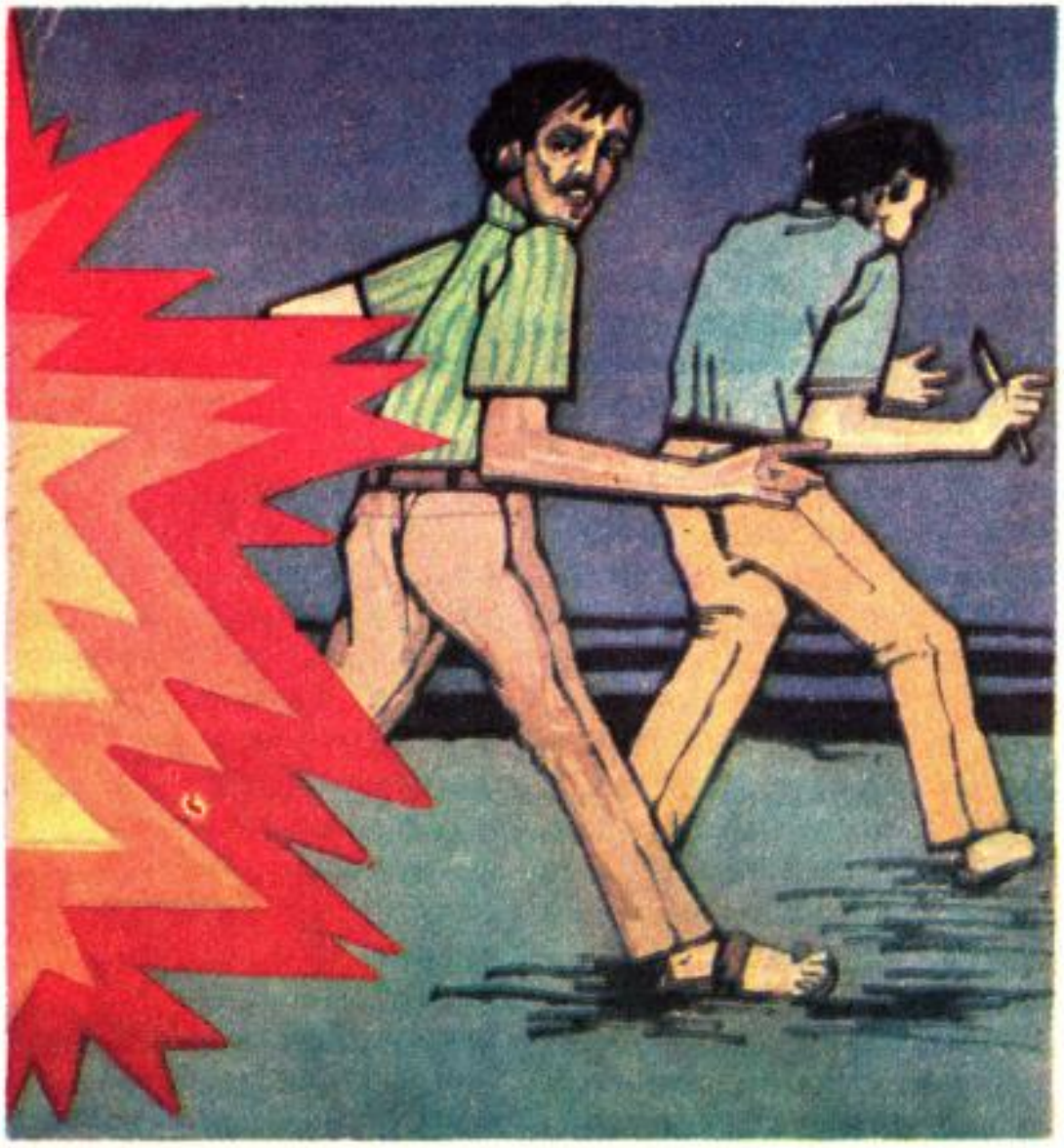

ফাটল। মাত্র হাত কয়েক দূরে। ধুলো-বালি, পাথরকুচি ঝেঁটিয়ে দমকা বাতাসের একটা ঝাপটা বয়ে গেল তার ওপর দিয়ে। বুক-ফাটা আর্তনাদ করে কারা যেন সশব্দে পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

বিদ্যুতের ঝাঁকি খেয়ে যেন সুনন্দ ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল। গল্পের বই দু'খানা তখনও শক্ত করে হাতে ধরা রয়েছে, ছাড়েনি। সামনে কী ঘটছে তা আর বুঝতে বাকি নেই।

কলকাতা এখন এই রকমই হয়েছে। আচমকা রাস্তার আলো নিবিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক বোমাবাজি শুরু হয়ে যায়। লোক-গিজগিজ-করা রাস্তাও নিমেষের ভোজবাজিতে জনশূন্য হয়ে যায়। এরকমই ঘটছে ইদানীং, তবে সুনন্দদের পাড়ায় এই প্রথম। সুনন্দ আর বড় রাস্তার ঝুঁকি নিল না, সামনের গলিটা দিয়ে শর্ট-কাট করবার জন্যে বাঁক নিল। পেছনে ততক্ষণে কালীপুজোর পটকা ফাটার মতো বোমা আর পাইপগান-পিস্তলের আওয়াজ হয়ে চলেছে সমান তালে। দুপক্ষই তৈরি, কুরুক্ষেত্র বেধে গিয়েছে।

বন্ধুর বাড়িতে আর যাওয়া হল না।

নিজের বই-দুখানা দিয়ে সুমিতের কাছ থেকে খানকয়েক গল্পের বই নিয়ে আসবে কথা ছিল। সব ভেস্তে গেল। কিন্তু গলিটা বড় রাস্তার চেয়েও ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুপাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা একেবারে কুলুপ আঁটা হয়ে গেছে। এ-অবস্থায় ছোটা যায় না, সাবধানে পা ফেলে এগোতে হয়। সেভাবেই এগোচ্ছিল সুনন্দ, এবং যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে, জুতোর শব্দ বাঁচিয়ে। এই গলিটা এঁকে-বেঁকে গিয়ে পাম ভিলায় পড়েছে। একটা অভিজাত কলোনি, এক প্যাটার্নের ছোট-ছোট গোটা-কুড়ি দোতলা বাড়ি নিয়ে পাড়াটা। প্রত্যেক বাড়ির সামনে দুটো করে পাম গাছ, এখনো বড় হয়নি, মাত্র বছরকয়েক হল লাগানো হয়েছে। পাম ভিলায় ওর এক মাসির বাড়ি। সেখানেই আপাতত আশ্রয় নেবে, তারপর আলো জ্বললে বাড়ি ফেরার কথা চিন্তা করা যাবে। দেরি হলেও ক্ষতি নেই, মাসির ওখান থেকে বাড়িতে ফোন করে দেওয়া যাবে। মতলবটা মাথায় আসতে সুনন্দর ভয় অনেকখানি কেটে গেল।

পাম ভিলায় পৌঁছে কিন্তু কাজটা অত সহজ মনে হল না। সেখানেও অন্ধকার। বাড়িগুলোও এক ছাঁদের, আলাদা করে চেনা যায় না। নম্বর পড়া তো দূরে থাক। তাছাড়া গলিটা পিছন দিক থেকে ওখানে গিয়ে পড়েছে। এ পথে সুনন্দ কখনো ওখানে যায়নি, যখনই গিয়েছে সামনের রাস্তা দিয়ে গিয়েছে। তাই মাসিদের বাড়িটা গুলিয়ে যাওয়ায় কিছুক্ষণ ইতস্তত করে এপাশে-ওপাশে ঘুরল। কোন্ রো-এর কত নম্বর বাড়ি, মনে করার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু মনে পড়ল না। একবার মনে হল মাঝের সারির, আবার মনে হল তার আগের। বাঁ দিক থেকে তৃতীয়, না ডান দিক থেকে ? কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া গেল না। বাড়িগুলো সব ভয়ে যেন চোখকান বন্ধ করে বসে আছে, জনমানবের চিহ্নও কোথাও দেখা গেল না যে কাউকে জিজ্ঞেস করবে। দিগন্তে বোধ হয় চাঁদ উঁকি মেরেছে ইতিমধ্যে। ওপর দিকে তাকালে অন্ধকার আকাশখানা এখন জ্যালজেলে গামছার মতো লাগছে। সেই আলোয় ইলেকট্রিকের তারে ঝুলন্ত ঘুড়িটা নজরে পড়ে গেল।

মনে পড়ল মাসির বাড়ির ঠিক সামনে বেশ কিছুদিন ধরে একটা লাল ঘুড়ি ঝুলছিল। এখন এই অস্পষ্ট ফ্যাকাশে আলোয় অবশ্য রঙটা বোঝা গেল না, তা না গেলেও বাড়িটা চেনা গেল। ইতস্তত না করে সুনন্দ তাড়াতাড়ি পা বাড়াল।

বাড়িতে ঢোকবার মুখটা নিরেট অন্ধকার, চোখ চলে না। তবে পথটা জানা, চওড়া প্যাসেজটা ধরে এগোলে নাক বরাবর একতলার সদর। ডান দিকে দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে, সেখানে অন্য ভাড়াটে থাকে। আন্দাজে পা ঘষটে-ঘষটে এগিয়ে গেল কিন্তু হিসেব মিলল না। আচমকা পা-টা হড়াত করে হড়কে গেল, এবং সেটা এত বে-কায়দায় যে ব্যালেন্স হারিয়ে সুনন্দ তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে বই দুখানা ছিটকে গেল দূরে কোথাও। কিন্তু বইয়ের কথা তখন কে ভাববে ! গদির মতো নরম কিছুর ওপরে সে মুখ থুবড়ে পড়েছে। মুখে-হাতে চটচটে তরল পদার্থ জড়িয়ে গেল। হাত দিয়ে বস্তুটা কী দেখতে গিয়ে আতঙ্কে তার শরীর একেবারে হিম হয়ে গেল। চিত হয়ে পড়ে থাকা একটা মানুষের দেহের ওপরে সে এসে পড়েছে। নিশ্চয় কোনো মৃতদেহ, নইলে এমন নিঃশব্দ, নিস্পন্দ কেন ? ঠোঁটে নোনতা স্বাদ পেয়ে বুঝতে বিলম্ব হল না চটচটে আঠালো পদার্থটা সামান্য জমাট-বাঁধা রক্ত ছাড়া কিছু নয়। খুন ! এই নির্জন অন্ধকারে একা একটা মড়ার সঙ্গে সে শুয়ে আছে ভাবতেই তার গলা চিরে একটা হতবুদ্ধি চিৎকার বেরিয়ে এল। কিন্তু ভয়ে আড়ষ্ট জিভ ঠেলে আওয়াজটা বেশি জোরে বেরোল না। কোনো রকমে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল

সুনন্দ আর ঠিক তখনি কারো পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। প্যাসেজ দিয়ে কেউ ঢুকছে, তার হাতের ব্যাটারি-ফুরনো টর্চ থেকে খুব মিটমিটে এক খাবলা ভুতুড়ে আলো এসে পড়ল প্যাসেজে। এবার সে আসল বিপদের গন্ধ পেল।

তারপর কী যে ঘটল সে নিজেও জানে না। বিপক্ষের গোলপোস্ট লক্ষ করে ছুটে যাওয়ার মতো প্যাসেজের ধাপ থেকে নেমেই বন্-বন্ দৌড়ল। প্যাসেজ জুড়ে এগিয়ে আসা লোকটা 'কে' বলে চেঁচিয়ে উঠেই সুনন্দর গোঁত্তা খেয়ে ছিটকে পড়ল। আর সেই ফাঁকে সুনন্দ যেন বুলেটের মতো অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল।

পাম ভিলার কম্পাউণ্ড তখনও পার হয়নি, সুনন্দকে চমকে দিয়ে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। লোড-শেডিংয়ের পর প্রথম যখন আলো আসে তখন ভোল্টেজ বোধ হয় খুব বেশি থাকে তাই চোখ ধেঁধে যায়। চোখ বন্ধ করে খুলে আলোর ঝাঁজ কাটিয়ে সুনন্দ নিজের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। তার পরনের সাদা প্যাণ্ট আর শার্টটার জায়গায় জায়গায় তাজা রক্তের ছোপ লেগে লাল হয়ে গেছে। এক পায়ের জুতোর ডগায় জেলির মতো থলথলে একদলা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

এক রাস্তা লোকের সামনে দিয়ে এই চেহারা নিয়ে কী করে বাড়ি যাবে মাথায় এল না। পুলিশের সামনে পড়ে গেলে নির্ঘাত থানায় টেনে নিয়ে যাবে। সত্যি, আর একটুক্ষণ আলো নিবে থাকলে কী ক্ষতি হত! একটা মাত্র উপায় মাথায় এল তার। কালবিলম্ব না করে তাই করল। যত জোরে দৌড়নো সম্ভব দৌড় লাগাল। লোকে এর ফলে কিছুটা ঝাপসা দেখবে, রক্ত না হোলির রঙে ছোপানো জামাপ্যাণ্ট পরেছে ঠিক ধরতে পারবে না। অনর্থক জবাবদিহির দায়ও এড়ানো যাবে। হলও তাই। এক রকম নির্বিঘ্নেই সে তাদের বাড়ির ফটকে পৌঁছে গেল।

এবার সমস্যা বাড়ির লোককে নিয়ে। এরকম রক্তাক্ত মূর্তি দেখলে সবাই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে হুলুস্থুলু বাধাবে। চোরের মতো বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল লাইন ক্লিয়ার। নিচের তলা বিলকুল ফাঁকা। শুধু মা রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে কী সব ছ্যাঁক-ছোঁক করছে। পা টিপে-টিপে জুতো পরেই বাথরুমে ঢুকে গিয়ে ছিটকিনি লাগাল। তারপর পটাপট পোশাক খুলে শাওয়ারের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। জুতো পরিষ্কার হয়ে গেল কিন্তু জামাপ্যাণ্ট থেকে রক্তের দাগ পুরোটা উঠল না। অগত্যা বালতির মধ্যে ও দুটো ভিজিয়ে দিয়ে তোয়ালে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়েই মায়ের সামনে পড়ে গেল।

শাওয়ারের জলে মন-মাথা দুইই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। বুকের ধুকধুকি আর উত্তেজনা খানিকটা, খানিকটা কেন অনেকটাই, থিতিয়ে এসেছে। জামাকাপড় বদলে স্বাভাবিক হয়ে প্রথমেই মনে পড়ল মাসিমার কথা। একটা টেলিফোন করে খবর নেওয়া দরকার। ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দোরগোড়া থেকে ফিরে এলেও সেখানে সঠিক কী কাণ্ড হয়েছে আগে জানা প্রয়োজন।

প্রথম বারে লাইন পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়বার ডায়াল করার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট মাসিমাকে পাওয়া গেল। বোধ হয় টেলিফোনের কাছেই ছিলেন।

"মাসি, তোমাদের ওখানে আলো আছে?"

"হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণ হল এসেছে। তোদের? তোদের ওখানে নেই বুঝি? এই দ্যাখ না, দুশ্চিন্তার ওপর দুশ্চিন্তা, তোর মেসোর আজ ট্যুর থেকে ফেরবার কথা, এখনো ফিরল না, তার ওপর—অ্যাঁ, তুই কী বলছিস একটু জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না...হ্যাঁ, আমাদের সদরে! কী? কী ব্যাপার?"

"কিছু না, ছোটমাসি, তুমি একবার

দরজাটা খুলে দেখই না তোমাদের সদরে কিছু ঘটেছে কি না ? কোনো কাণ্ড-টাণ্ড, ঝট করে বেরিয়ে পড়ো না যেন, সামান্য ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখ। আমি ফোন ধরে থাকছি—"

ছোটমাসি খুব নার্ভাস হয়ে গেছেন বোঝাই গেল, ফোনটা টেবিলের ওপরে শব্দ করে নামিয়ে রেখে তখনই বোধ হয় সদর দেখতে ছুটলেন। পরেশদা আর গণেশদা ছোটমেসোর দুই ভাইপো, ওঁদের ওখানে থেকে কলেজে আর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। মাসির নিজের কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি এখনো।

বেশিক্ষণ ফোন ধরে থেকে উত্তেজনা ভোগ করতে হল না সুনন্দর। আধ-মিনিট বাদেই মাসি ফোনে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন না বলে ফেটে পড়লেন বলাই ভাল। গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে বললেন, "অবস্থা ভাল না।"

"কীসের ?"

"তোমার। তোমার মাথার কথা বলছি। দরজা খুলেই বুঝতে পারলাম গেছ! একেবারেই গেছ! গোয়েন্দা-ভূত যেদিন থেকে তোমার মাথায় চেপেছে সেদিনই আমাদের বোঝা উচিত ছিল। উঃ বাবা! খামোকা এমন করে মানুষকে ভয় পাওয়াতে আছে নাকি!"

সুনন্দর সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ছোটমাসি এসব কী বলছে! ছোটমাসি আর এক প্রস্থ সস্নেহ গালমন্দ করে যা বললেন তা অবিশ্বাস্য। ওঁদের সদরের সামনের প্যাসেজে মানুষ দুরের কথা একটা মরা ইঁদুর কি টিকটিকিও পড়ে নেই। এক ফোঁটা রক্তের দাগ পর্যন্ত না।

॥ ২ ॥

জানলা খোলা ছিল। ফটাস করে কিছু একটা গায়ের ওপর এসে পড়তেই ভোর-ঘুমের চটকা ভেঙে গেল সুনন্দর। প্রতিদিনকার মতোই হকার অর্জুন সিং নির্ভুলহাতে লক্ষভেদ করেছে। নীচের

ফটকের কাছ থেকে দড়ি-বাঁধা ইংরেজি, বাংলা দুখানা খবরের কাগজ দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে পাখির মতো উড়ে এসে ডিভানে সুনন্দর গায়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। অদ্ভুত টিপ ওর হাতে, চলন্ত সাইকেল থেকেই কাগজ ছুঁড়ে মারে অর্জুন।

ইংরেজি কাগজখানা বাবার। সুনন্দ উঠে গিয়ে কাগজখানা বাবার বেড-সাইড টেবলে রেখে এল পা টিপে-টিপে। অনেক রাত অবধি লেখাপড়ার কাজ করেন বলে বাবার উঠতে বেলা হয়। উনি যখন ঘুমোন তখন ওঁকে ডাকা বারণ, তাই বেড-টি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সেটা সরিয়ে আর এক কাপ রেখে আসা হয়। নিঃশব্দে। ভজাদা বোধ হয় চা রেখে এল এই মাত্র। তার ট্রে-র ওপর এখন শুধু সুনন্দর দুধের গ্লাস। সুনন্দ নাক সেঁটকাল। সকাল বেলায় গ্লাসভর্তি দুধ দেখলে তার মেজাজ গুলিয়ে ওঠে। ভজাদা ব্যাপারটা জানে, মজা পায়। মুচকি হেসে গ্লাসটা টিপয়ের ওপর একটু শব্দ করেই নামিয়ে রেখে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের কায়দায় বলল, "আপনি হয়তো জানেন না, এর প্রতি চুমুকেই রক্ত।"

অন্য দিন হলে খেপে উঠত সুনন্দ, দাঁত খিঁচিয়ে বলত, তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না, নিজেকে খেতে হলে বুঝতে!

কিন্তু আজ কিছুই বলল না, ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকল, গ্লাসের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। ভজাদার মুখে রক্ত কথাটা শুনে ভেতরে-ভেতরে চমকে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে কী একটা কথা মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি কাগজ খুলল। ওপর-নীচে চোখ বুলোতেই নজর আটকে গেল প্রথম পাতার তলার দিকে। বেঁটেখাটো তিন কলম জুড়ে খবরটা বেরিয়েছে: ভর সন্ধেয় বেপরোয়া বোমাবাজি।

এই হেডলাইনের তলায় মাসিদের পাড়ার খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ লিখেছেন রিপোর্টার। পাশেই রাস্তায় শুয়ে থাকা তিন যুবকের মৃতদেহের ছবি বেরিয়েছে। তলায় লেখা: খুনের রাজনীতির তিন শিকার। গতকাল নাকি ঐ এলাকার আলো নিবিয়ে দিয়ে দুই দলের মধ্যে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে প্রচণ্ড লড়াই হয়। উভয় পক্ষই বোমা,

পিস্তল, পাইপগান যথেচ্ছ ব্যবহার করে। তিনজনের সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যু হয় এবং আরও ছ-জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা রীতিমত আশঙ্কাজনক। উক্ত ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং এ-ব্যাপারে জড়িত থাকার অভিযোগে পঁয়ত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে গোয়েন্দা বিভাগ বেশ কিছু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করেছে।

সংবাদটা পড়ে সুনন্দ কিছুটা যেন হতাশ হল। পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, খবরের কাগজের লোক সবাই এল, দলে দলে পাড়ার লোকও নিশ্চয় বেরিয়েছিল কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও মাসির বাড়ির সেই ঘটনার কোনো উল্লেখ হল না। খুনিরা নিশ্চয় সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মৃতদেহটা পাচার করে ফেলেছিল। পাম ভিলার ঘটনাটা কি তাহলে আলাদা কিছু ? অন্য ডেডবডিগুলো যেখানে যেমন পড়ে রইল কিন্তু ...

"ভাই, একটা লোক তোমাকে ডাকছে।" ভজাদা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, "এ কী,দুধটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল !"

অন্যমনস্ক সুনন্দ জিজ্ঞেস করল, "কে লোক ?"

"চিনি না। ফটকে দাঁড়িয়ে আছে।"

"ঠিকাছে তুমি যাও।" কাগজ রেখে সুনন্দ উঠে দাঁড়াল,তারপর আলনা থেকে শার্টটা টেনে নিল।

"উঁহু, আগে দুধটা।" দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ভজাদা বলে।

শার্টের মধ্যে মাথা গলানো হয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থাতেই ভজাদার বগলের তলা দিয়ে পাকা গাদি খেলোয়াড়ের মতোসুড়ুত করে বেরিয়ে পড়ে গুপি গাইনের ভূতের গলা নকল করে সুনন্দ বলল, "হবে হবে সব হবে"—তারপর তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তর-তর করে সিঁড়ি ধরল।

যে লোকটি ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তার চেহারা দেখে কী রকম খটকা লাগল সুনন্দর। ছ-ফুটের মতো লম্বা মানুষটার মাথায় পালোয়ানি ছাঁট, কিন্তু পরনে টেরিলিনের হাঁটুঝুল পাঞ্জাবি আর অদ্ভুত কায়দায় মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতির সঙ্গে রাগী-রাগী চেহারার নাগরা কেমন যেন বেমানান।

সুনন্দ বাঁকা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কী দরকার ?"

লোকটা ভাঙা গলায় শুধালো, "সুনন্দ বাগচী ?"

ও ওপর-নীচে মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' জানাল।

"বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।" লোকটা আঙুল বাড়িয়ে গলির মুখে দাঁড়িয়ে-থাকা জিপগাড়িটাকে দেখাল। লোকটার আসল চেহারা এবার স্পষ্ট হল। চুলের ছাঁট, সেই সঙ্গে "সোঙ্গে দে-খা" শব্দদুটোর অবাঙালি উচ্চারণ থেকেই পরিচয়টা ধরতে পারা উচিত ছিল।

জিপটা পুলিশের। কিন্তু দূর থেকে তা বুঝতে পেরেও চমকায়নি সুনন্দ। বাবার বন্ধু কমলেশকাকা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে উঁচু পোস্টে আছেন। ডেপুটি কমিশনার। কত-কত দিন এরকম হুট করে চলে আসেন। বাবার সঙ্গে আইনের জটিল মার-প্যাঁচ নিয়ে আলোচনা করেন, ছুটিছাটায় মেজাজ হলে বেদম দাবা খেলেন। কিন্তু এর বাইরেও মজার মানুষ কমলেশকাকার আর একটা আকর্ষণ আছে এবাড়িতে। সুনন্দর সঙ্গে তাঁর একটা গোপন বন্ধুত্ব আছে। কোনো জটিল কেস নিয়ে তিনি যখন হিমসিম খান তখন সুনন্দর সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতে আসেন। তিনি অন্তত সেই রকমই বলেন। আসল ব্যাপারটা যে কী, সুনন্দ জানে। আসলে কমলেশকাকা তাকে উপলক্ষ করে নিজের

মনের সঙ্গেই নিজে কথা বলেন। চিন্তা-ভাবনাকে এক-পেশে হতে না দিয়ে তাকে তাসের মতোই এক হাতে জড় করে নতুন করে ভেঁজে নেন। এই কাজে সুনন্দকে তাঁর দরকার। সুতোর জট খুলতে হলেও একজনের ধরতাই দরকার, যে বিশ্বস্ত হাতে একটা প্রান্ত ধরে থাকবে। কমলেশকাকা অবশ্য তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ছোটরা আদতে ছোট নয়। তাদের তাজা চোখ, তাজা মন। বড়রা বিদ্যেবুদ্ধির ধার-করা চশমায় যতটুকু দেখতে পায় ছোটদের নতুন চোখ তার চেয়ে অনেক বেশি দেখে। তাদের মন নির্মল, সত্যের খুব কাছাকাছি তারা আছে। সাংসারিক জ্ঞানটাই বড় কথা নয়, ওটা টুকরো জ্ঞান, কূটকচালে বুদ্ধি ওকে আচ্ছন্ন করে থাকে, স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে দেয়।

এই সব পুরনো কথা ভাবতে-ভাবতে জিপের কাছে গিয়ে চমকে গেল সুনন্দ। কমলেশকাকা নয়, একজন অপরিচিত পুলিশ-ইন্সপেকটার গাড়ির মধ্যে বসে আছেন। স্টিকিং প্লাস্টারের মতো মুখে এক টুকরো অনড় হাসি লেগে আছে, যা দেখলেই বোঝা যায় মানুষটা খুব নিষ্ঠুর।

"এই যে, সুনন্দ তোমার নাম ? কোন্ ক্লাসে পড়ো ?"

ঘাড় দুলিয়ে ও বলল, "ক্লাস এইটে।"

"বাঃ। এ দুখানা তোমার বই ?"

ব্যস্ত হয়ে সুনন্দ বই দুখানা ফিরে পাবার জন্যে হাত বাড়াল। বলল, "হ্যাঁ আমার বই। দেখুন ভেতরে আমার নাম-ঠিকানা লেখা আছে।"

"আহা, আহা এত ব্যস্ত কেন!" ইন্সপেকটার দাঁতের ছুঁচলো ডগা বের করে হাসলেন, "তোমার বই যখন তুমি তো পাবেই, কিন্তু তার আগে, বই দুখানা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, "আমাদের একটু গল্প-সল্প হোক। কী বলো ?"

কী আর বলবে সুনন্দ। গল্প-সল্প করা নিশ্চয়ই ভাল, সুনন্দ পছন্দও করে কিন্তু বোধ হয় এ-রকম লোকের সঙ্গে নয়। তাছাড়া ভদ্রলোকের গলার সুরটা খুব নিরীহ ঠেকল না। মনে হল এই গল্পের তলায় কোনো মতলব আছে।

ব্যাজার মুখে বলল, "বলুন ?"

"এই বই দুখানা তুমি ভাই কোথায় ফেলে এসেছিলে মনে পড়ছে ?" ভাল মানুষের মতো মুখ করে ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ, আমার মাসির বাড়ির দরজার সামনে।"

"উঁহু, আমি যদি বলি পাম ভিলার একটা বাড়িতে !"

"ওটাই আমার ছোটমাসির বাড়ি।"

"আচ্ছা সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে। সময়টা আগে জানা দরকার। তখন কটা বাজে ?"

"আমার কাছে ঘড়ি ছিল না।"

"তবু আন্দাজ ?"

"সন্ধে সাতটার কাছাকাছি হবে। ওই যখন লোড-শেডিং হয়েছিল।"

"হুঁ, সত্যি কথা বলছ দেখে খুশি হয়েছি।"

"মিথ্যে কথা কেন বলব ?"

"হুঁ, তা তো বটেই, কেন বলবে !" পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে বেশ ধীরে-সুস্থে সিগারেট ধরালেন, যেন তাঁর কথা শেষ হয়ে গেছে, যেন তাঁর এখন কিছুই করার নেই, কোনো তাড়া নেই। অসহিষ্ণু সুনন্দ দাঁড়িয়ে থাকল। বইদুখানা তো বাবা দিয়ে দিলেই হয়। সে তাহলে বাড়ি চলে যেতে পারে।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক আচমকা প্রশ্ন করলেন, "তোমার সঙ্গে তখন আর কে-কে ছিল ? তাদের ঠিকানাগুলো বলে ফেল। তারপর তোমার বইদুখানা নিয়ে বাড়ি চলে যাও।" ভদ্রলোকের কোলের ওপরে একখানা কালোরঙের বড় ডায়েরি ছিল, সেটা খুললেন। পকেট থেকে বলপেনটা নিতে যাবেন এমন সময় সুনন্দর

কথা শুনে থেমে গেলেন।

"আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না।"

"ছিল।"

"না।" একটু থেমে জোরের সঙ্গে ফের বলল, "আমি বলছি ছিল না।"

ভদ্রলোকের গলা থেকে মোলায়েম ভাবটা এবার একেবারেই ঝরে গেল। গম্ভীর গলায় বললেন, "কিন্তু আমাদের কাছে অন্য রকম খবর আছে। তুমি একা ছিলে না।"

বারবার মিছিমিছি একই কথা বলায় সুনন্দর রাগ হল। একটু চুপ করে থেকে চেরা গলায় বলল, "না, একা ছিলাম না।"

"দলে কজন ছিল?" ইন্সপেকটার ভেতরে-ভেতরে কিছুটা যেন উল্লসিত হলেন, "এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা!"

মনে মনে ভেংচি কেটে সুনন্দ বলল, "আমি ছাড়া আরও চারজন।"

"গুড! বুক-পকেট থেকে বল-পেন চলে এল হাতের মুঠোয়। বুড়ো আঙুলের খোঁচায় ক্লিক করে উঠল কলমের স্প্রিং বসানো মুণ্ডি। নোট-বইয়ের পাতায় কলম তৈরি রেখে নরম গলায় শুধোলেন, "তাদের নাম?"

মুচকি হেসে সুনন্দ বলল, "হেমেন্দ্রকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, বাকি দুজনের নাম জানি না, মুখও দেখতে পাইনি।"

হেমেন্দ্রকুমারের নামটা পুরোই লিখে ফেলেছিলেন, সত্যজিতের দন্ত্য স পর্যন্ত লিখেই থমকে গেলেন ভদ্রলোক। অতি পরিচিত নাম, কেমন খটকা লাগল, সন্দিগ্ধ চোখে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলেন ছেলেটা মুচকি-মুচকি হাসছে। রক্তবর্ণ মুখখানা যেন রাগে ফুলে উঠল। মেঘ-ডাকা গলায় দাবড়ে উঠলেন, "ফচকে ছোকরা! এখনো গাল টিপলে দুধ বেরোয়, পুলিশের সঙ্গে রসিকতা করচো! মরবার সাধ হলে এক রত্তি পিঁপড়েরও পাখা গজায়! তোমার দেখছি ডানা গজিয়েই গেচে! উঠে এসো"—ড্রাইভারের দিকে সরে গিয়ে পাশে জায়গা করলেন।

"কেন?" সুনন্দ তেজি গলায় বলল, "কোথায় যেতে হবে?"

"যেতে হবে এইটুকু শুধু জেনে রাখো।

ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।"

সুনন্দ কিন্তু জিপে ওঠার কোনো লক্ষণই দেখাল না। একগুঁয়ে জেদি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার নামে ওয়ারেন্ট কই ? দেখান।"

এক মুহূর্তে থিতিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এইটুকু ছেলের কাছ থেকে এ-রকম প্রশ্ন আশা করেননি। দ্বিগুণ রেগে হুঙ্কার ছাড়লেন, "হনুমৎ সিং ! উঠাও ইসকো ! পাকাড়কে !"

সেই টেরিলিনের পাঞ্জাবি কখন যে ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে টেরও পায়নি। বেড়ালের ইঁদুর ধরার মতো কিছু বুঝতে পারার আগেই সুনন্দকে সে দুহাতে শূন্যে তুলে ফেলল। তার পর তাকে এক প্যাকেট তুলোর মতই অনায়াসে ভদ্রলোকের পাশে বসিয়ে দিয়েই অস্ফুট আর্তনাদ করে দু-পা পিছিয়ে গেল। একটা হাত দিয়ে অন্য হাতটা চেপে ধরেছে দেখা গেল।

ইন্সপেকটার অবাক, "কেয়া হুয়া ?"

"একদম কাট দিয়া হুজৌর ! বিল্লি কা মাফিক কামড়িয়েসে !"

"হুঁ ! সর্ষের ঝাঁজ কী করে বের করতে হয় আমার জানা আছে।"

গাড়ি কখন স্টার্ট নিয়েছিল সুনন্দ জানে না, ইন্সপেকটারের হাতের ইশারায় জিপটা চলতে শুরু করল। হনুমৎ সিং লাফিয়ে উঠে পড়ল গাড়ির পিছন দিকে।

সোজা থানায় নিয়ে গিয়ে লক-আপের সামনে হাজির করা হল যখন, সত্যি বলতে কী সুনন্দর বুকটা তখন কেঁপে উঠেছিল। ভেতরে-ভেতরে সে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল, যদিও তার মুখ দেখে খুব সম্ভব পুলিশের ঝানু চোখও তা অনুমান করতে পারেনি।

এই তের-চোদ্দ বছর বয়সে কে ফুরিয়ে যেতে চায় ! কত স্বপ্ন কত সাধ কত সম্ভাবনা সব শেষ। চোখের সামনে থেকে এই সুন্দর পৃথিবীকে আড়াল করে দেবে

জেলখানার দেওয়াল। বাকি দিনগুলো নির্মম, নিঃসঙ্গ, একলা। ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে গিয়েছিল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সামনে তাকাল। মোটা-মোটা লোহার গরাদে দেওয়া দরজার ওদিকে একগাদা লোক, কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন বয়স্ক পুলিশ অফিসার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "যদি সত্যি কথা বল, তাহলে কোনো ভয় নেই, কেউ তোমাকে কিছু করতে পারবে না। আমরাও তোমাকে ছেড়ে দেব। আর যদি না বলো তাহলে তোমাকেও ওদের সঙ্গে চালান করে দেব।"

সুনন্দ ভেতরের লোকগুলোকে দেখছিল। দু-চারজন বাদে সকলকেই স্বাভাবিক মানুষ মনে হল, চোর-ডাকাত খুনে বদমাস কেউ না। বেশির ভাগই বয়সে তরুণ, হয়তো কলেজে কি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কেউ কেউ বুঝি ছাত্রজীবন শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছে। কিন্তু চেনা নয়, কেউই তেমন করে চেনা নয়। পাড়ার রাস্তায় চলাফেরায় মুখচেনা গোছের, নাম-ফাম জানে না।

মাথা নেড়ে সুনন্দ সে-কথা জানাল। এই বয়স্ক অফিসারটিকে তুলনায় ভাল মানুষ বলেই মনে হল। তিনি সুনন্দর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন যেন ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছিলেন। বোধহয় সুনন্দর কথা তাঁর বিশ্বাসযোগ্যই মনে হল। কাঁধে হাত রেখে বললেন, "মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথাই বলছ। আচ্ছা, এসো,আমার ঘরে এসো। তোমাকে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করব। কিচ্ছু লুকোবে না, সব বলবে!"

ভদ্রলোকের পেছন-পেছন সুনন্দ থানার মূল অফিস ঘর পেরিয়ে ভেতরের আর একখানা ঘরে ঢুকবার সময় বাইরের ঘরে সেই ইন্সপেকটারকে দেখতে পেল। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কিছু লেখায় ব্যস্ত, কিন্তু তারই ফাঁকে একবার রাগী চোখ তুলে তাকে দেখাও হয়ে গেল। সুনন্দ অস্বস্তি বোধ করল।

ওরা ভেতরে গিয়ে বসার পরেই একজন সিপাই এসে দুকাপ চা আর কিছু বিস্কুট রেখে গেল। বোধহয় আগেই বলা ছিল।

"তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু খাওয়া হয়নি, মিষ্টি আনাব, খাবে?"

এরকম ব্যবহার অবশ্য আশাই করেনি সুনন্দ, মনের ভেতরটা কেমন ছল-ছল করতে লাগল। সে ঘাড় নেড়ে 'না' জানাল। চা খাওয়া হয়ে যাবার পর ভদ্রলোক সুনন্দর মুখ থেকে কাল সন্ধেবেলার অভিজ্ঞতার কথা সব শুনলেন। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তুমি মাসির বাড়ি মনে করে যে-বাড়িতে ঢুকেছিলে সেটা পামভিলার ডাক্তার ঘোষরায়ের বাড়ি। নম্বর শুনে মনে হচ্ছে তোমার মাসি থাকেন ওর দু-সারি পিছনের কোনো বাড়িতে। কাল বিকেল থেকে সন্ধেবেলার মধ্যে ওই ডাক্তারবাবুটি খুন হয়েছেন। তাঁর মৃতদেহটি এখনো সেখানেই পড়ে রয়েছে। এক্ষুনি আমাকে একবার সেখানে যেতে হবে, তুমিও যাবে সেখানে। ওখান থেকে পালাবার সময় তুমি যাকে টর্চ হাতে ঢুকতে দেখেছিলে সে সম্ভবত ডাক্তারবাবুর ভাগনে। তুমি তাকে চিনতে পার কিনা দেখা যাবে।"

॥ ৩ ॥

পামভিলায় পৌঁছে সুনন্দ দেখল সেখানে পুলিশ থৈ-থৈ করছে, কম করেও খানচারেক পুলিশের গাড়ি একপাশে দাঁড়িয়ে। একখানা অ্যাম্বুলেন্সও এসে গেছে। কনেস্টবলরা কৌতূহলী দর্শকদের ভিড় হঠাতে হিমশিম খাচ্ছে।

আপনা থেকেই তার চোখ চলে গেল ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে থাকা ঘুড়িটার দিকে। তারা যে-বাড়িতে ঢুকবে ঠিক তার মাথার ওপরেই অবশ্য ঘুড়িটা ঝুলছে। কিন্তু ঘুড়িটা অন্য, কালো রঙের একখানা ঢাউস চাঁদিয়াল। বুঝতে পারল এই ঘুড়িটাই যত

গোলমালের কারণ। এটাকে নিশানা করেই সে ভুল বাড়িতে ঢুকেছিল।

থানার ও· সি· সেই বয়স্ক ভদ্রলোক গাড়িতে বসেই তাকে দেখালেন। তিরিশ-বত্তিরিশ বছরের যে যুবকটি বাড়ির সামনে একটা চেয়ার পেতে বসেছিল তার চেহারাটা বেশ ঢ্যাঙা। একমাথা বড়-বড় কোঁকড়া চুল, পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। গালে হাত দিয়ে অত্যন্ত বিষণ্ণ ভঙ্গিতে সে কিছু ভাবছিল, মাটির দিকে চোখ। ওর কাঁধে হাত রেখে ওরই সমবয়সী একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বন্ধুটন্ধু হবে। কাছে যেতেই চমকে তাকিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। আর তখনই চোখে পড়ল তার তলপেটের কাছে জামার ওপর একটা হাতের ছাপ। দোলের দিনে যেমন অনেকের জামার পিঠে দেখা যায়।

ও· সি· জিজ্ঞেস করলেন, "দেখুন তো সুনীতিবাবু, এই ছেলেটিকে আপনি চিনতে পারেন কি না।"

ঘন-ঘন পলক ফেলে লোকটা সুনন্দকে দেখে মাথা নাড়ল, "না। কে এ?"

"বাড়িতে ঢোকার মুখে কি এর সঙ্গেই আপনার ধাক্কা লেগেছিল, মনে করে দেখুন।"

লোকটাকে খুব ক্লান্ত আর নার্ভাস দেখাচ্ছিল। রাতটা হয়তো একরকম না খাওয়াই গেছে। চোখের কোলে কালো ছোপ পড়েছে। বোধহয় সারা রাত ঘুমোতে পারেনি, তার ওপর এত বড় একটা দুর্ঘটনা। এত হৈ-চৈ, পুলিশ আর একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদে তার মুখ শুকিয়ে গেছে। সে কাঁপা-কাঁপা ক্লান্ত গলায় বলল, "আপনাদের তো আমি অনেকবার বলেছি, আমি কাউকেই দেখতে পাইনি। টর্চে তো আলো ছিল না বললেই চলে, তাছাড়া আচমকা ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। কেউ একজন আমাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে পালাল, এর বেশি কিছু টের পাইনি।"

তাকে বসতে বলে ও· সি· সুনন্দকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। সুনীতি চোখের আড়াল হতেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। সুনন্দ জানাল, "হতে পারে। চেহারা দেখতে পাইনি তবে এই রকমই ঢ্যাঙা মনে হয়েছিল আমার।"

সুনন্দর গাটা কেমন শির-শির করে উঠল। সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে প্যাসেজ জুড়ে। মৃতদেহ। কাপড়ের ঢাকা ছাড়িয়ে জমাট-বাঁধা পুরু রক্ত, এক জায়গায় রক্তে জুতো ঘষটানোর দাগটাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল। ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরের ঘরগুলোয় এক গাদা স্যাদা পোশাকের লোক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কী সব করছে। ডেড বডি পাহারা দিচ্ছিল একজন কনেস্টবল, সে সশব্দে একখানা প্রমাণ-সাইজের সেল্যুট করে বলল, "ডি সি ডি ডি সাহেব এসে গেছেন, আপনার খোঁজ করছিলেন।"

ও· সি· ব্যস্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। যাবার সময় সুনন্দকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গেলেন।

তন্ময় হয়ে এই সব দেখছিল সুনন্দ, এমন সময় ভেতরের কোনো ঘর থেকে কমলেশকাকা বেরিয়ে আসতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন, তারপর হৈ-হৈ করে উঠলেন, "আরে সুনন্দ যে, কী ব্যাপার, তুমি এখানে কী করে?"

ও· সি· পাশেই ছিলেন, নিচু গলায় কিছু বললেন। শুনে কমলেশকাকা চটে গেলেন মনে হল। চটে গেলেই তিনি ওরকম নরম, নিরুত্তাপ গলায় কথা বলেন। বললেন, "সত্যি আপনাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। কমনসেন্সের কথা ছেড়েই দিলাম, পুলিশ হলেই কি এত ক্রুড হতে হয় সব সময়। এই ছেলেমানুষকে নিয়ে এত টানাহেঁচড়া করলেন কিন্তু একে চিনতেই পারলেন না আপনারা কেউ। ক'মাস আগেই তো কাগজে এর ছবি বেরিয়েছিল, আপনাদেরই থানার কেস। বিধভূষণ

ব্যানার্জি বোধহয় তখন থানার চার্জে ছিলেন। সেই ফিল্ম প্রোডিউসার শিবশঙ্করবাবুর জহরত লোপাটের মামলা। এই খুদে গোয়েন্দা সুনন্দর বুদ্ধিতেই কেসটার কিনারা হয়েছিল, মনে নেই ?"

ও· সি· হাত কচলাতে-কচলাতে বললেন, "এক্সট্রিমলি স্যরি, স্যার। কালকের ঘটনায় একদম মাথার ঠিক ছিল না। আমাদের নতুন সাব-ইন্সপেকটার ঘোষালই আসলে এর জন্যে দায়ী। আমি তাকে যা বলার বলেছি। সত্যি আমি দুঃখিত।"

কমলেশকাকা বললেন, "ঠিক আছে, যা হবার হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে মনে রাখবেন। ঘোষালকেও আমার নাম করে বলবেন। এই কেসেও সুনন্দ প্রাইভেটলি আমাকে অ্যাসিস্ট করবে।"

কৃতার্থের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে ও· সি· বললেন, "এসো বাবা সুনন্দ। আর কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। তোমার ইনভেস্টিগেশনের কাহিনী আমি জানি, তোমার মতো বয়সে ভাবাই যায় না। এসো, এসো।"

সুনন্দকে পিঠ চাপড়ে আদর করলেন ভদ্রলোক। তারপর কমলেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে লাশটা কি স্যার মর্গে চালান করে দেব ?"

কমলেশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তবে আর মিনিট-দশেক অপেক্ষা করতে বলুন ওদের। ডেড বডিটা আমি আর একবার দেখব।"

"ইয়েস স্যার।" ও· সি· সেল্যুট দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কী মনে পড়তে আবার ফিরলেন।

"আমাদের এ· এস· আই· বিপিন আছে এখানে, ওকে বললেই খুলে দেখাবে। আমি তাহলে ওদিকটা দেখিগে।"

উনি চলে যাবার পর একা পেয়ে কমলেশকাকা বললেন, "শোনো, সংক্ষেপে আমাদের কাহিনীর খসড়াটা শোনো। কাল সন্ধেয় এখানকার সদর রাস্তার মোড়ে প্রচণ্ড স্ট্রিট লড়াই হয়ে গেছে। সেই ব্যাপারটা নিয়ে এখানকার থানা আর লালবাজার ঘণ্টা-দুই রীতিমত কসরত করেছে। ধরপাকড়, হাসপাতাল, প্রেস সামলানো, সব হবার পরে সবে থানার লোকেরা স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলে বিশ্রামের উদ্যোগ করছে—এমন সময় ডাক্তার ঘোষরায়ের খুনের খবর গিয়ে নতুন করে ওদের চমকে দিল। যার ফলে আমাকেও শেষ পর্যন্ত আবার ছুটে আসতে হল। কারণ এটাও পলিটিক্যাল মার্ডার, যদিও সন্ধের স্ট্রিট ফাইটিংয়ের সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য আছে। রাস্তায় যারা মরেছে কিংবা আহত হয়েছে তারা সবাই দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মী। ঐ সূত্রে যারা ধরা পড়েছে তারাও তাই। কিন্তু এই কেসটা একটু অন্যরকমের। এখানে যিনি ভিকটিম বা শিকার হয়েছেন তিনি জীবিকায় ডাক্তার। শল্য-চিকিৎসক, মানে সার্জেন। ধর্মতলার কাছে তাঁর চেম্বার। বাড়িতেও রুগি দেখেন, শুধু বৃহস্পতিবার বাদ। কাল বৃহস্পতিবার ছিল। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোন সংস্রব ছিল না।"

একটু থেমে কমলেশকাকা পকেট থেকে সুদৃশ্য চামড়ার চুরুট-কেসটা বের করলেন। তার থেকে পছন্দসই একটা চুরুট বের করে চট করে ধরিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন আবার। "মানুষটা ছিলেন নির্বিরোধ। বিয়ে-থা করেননি। নিজের বলতে এক ভাইপো, সেও ডাক্তার। টাটানগরে হাসপাতালে চাকরি করে। আর এক দূর সম্পর্কের ভাগনে সুনীতি—তাকে ডাক্তারবাবু নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছেন। এই ফ্ল্যাটেই সে থাকে এখনও। কোনো মার্চেন্ট অফিসের কেরানি, গানবাজনার শখ আছে। শখের থিয়েটারে নাটক-ফাটকও করে।"

কমলেশকাকার চুরুট নিবে গিয়েছিল। তিনি আবার দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে নিলেন। দামি চুরুটের একটা চাপা সুগন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। সকাল বেলার ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা সুন্দর কেটে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। কমলেশকাকার প্রশ্রয়ে আর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বে সে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। নিজেকে আর ছোট কিংবা ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল না। গল্পের বইয়ের শখের গোয়েন্দার মতো তার স্বাধীন মতামতের একটা বিশেষ মূল্য আছে এই মানুষটার কাছে। সে জানে যে-কোনো মুহূর্তে কমলকাকু তার পরামর্শ চেয়ে বসবেন।

তাঁর সেই বিশ্বাস, সেই মর্যাদা রাখবার জন্যে সুনন্দ চোখে-কানে-মনে সজাগ সতর্ক আর প্রখর হয়ে অপেক্ষা করছে।

"কাল সন্ধেবেলা আমেরিকান সেন্টারে ছবি দেখে বাড়ি ফিরছিল সুনীতি। পাড়ায় ঢুকে দেখে সব অন্ধকার। লোডশেডিংয়ের এখন আর কোনো নিয়ম নেই, যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঝপ্ করে আলো নিবলেই হল। সুনীতি তাই পকেটে ছোট একটা টর্চ রাখে সব সময়। টর্চ জ্বেলে বাড়ির ভেতর যেই ঢুকে গেছে অমনি কে যেন ছুটে এসে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল, তারপর চোখের পলকে পালিয়ে গেল।"

সুনন্দ অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "আমি।"

কমলকাকু হেসে বললেন, "জানি। সুনীতি ছোকরার চেহারাখানাই যা দশাসই ভেতরে-ভেতরে মানুষটা কিন্তু ভিতুর ডিম। না হলে তোর ওই ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ার কথা নয়। আর একটা গোপন ব্যাধি ওর আছে, সেটা হল ভূতের ভয়। পকেটে টর্চ রাখার আসল কারণটাও ওইখানেই। যে কথা বলছিলাম, ধাক্কা খেয়ে আঁতকে উঠেছিল সুনীতি, ভড়কে গিয়েছিল আগে থেকেই। তাই টর্চ কুড়িয়ে পেয়ে ফের জ্বালতেই থৈ-থৈ রক্তের মধ্যে একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে প্রায় মূর্ছা যাবার দশা। মৃতের মুখ দেখার সুযোগও আর পেল না। পড়িমরি করে ওখান থেকে পালিয়ে সোজা এক বন্ধুর বাড়ি। কারণ ও ধরেই নিয়েছিল মামা তখনো বাড়ি ফেরেনি। ছুটির দিনে ডাক্তারবাবু সন্ধের দিকে লোক-লৌকিকতা সারেন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে কিংবা ক্লাবে যান। ফিরতে রাত হয়। সুতরাং মামা ফিরে এসে যা করবার করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে একলা ওই ফ্ল্যাটে ঢোকার সাহস তার নেই। দোতলার ভাড়াটেরাও বেশ কয়েকদিন হল বাড়ি বন্ধ করে কোথায় গেছে। সুনীতি অপেক্ষা করে করে নটা নাগাদ একবার বাড়িতে ফোন করে, কিন্তু কেউ ফোন ধরে না। বুঝতে পারে মামা ফেরেনি। তারপর দশটায়। শেষে সাড়ে দশটায়ও যখন তাদের ফ্ল্যাটে শুধু রিং হতেই থাকে তখন খুব ঘাবড়ে যায়। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা মাথায় আসে। যে ডেডবডিটা সে প্যাসেজে দেখে এসেছে সেটা মামার নয় তো! কথাটা মনে হতেই হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তখন মনে পড়ে লোকটার গায়ে যে রঙের জামা প্যান্ট দেখেছিল ওইরকম রঙের তার মামারও আছে। তখন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে সোজা থানায়।" কমলকাকু চুপ করে চুরুটে গোটাদুই টান দিয়ে বললেন, "চল, ডেডবডিটা এবার দেখি। তুই ওই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যাবি না তো?"

বিপিন কনেস্টবল খুব আলগোছে সাদা চাদরটা তুলে নিল।

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। প্রথম ধাক্কাটা ইলেকট্রিক শকের মতো ভেতরটা শিউরে দিল। কালীপুজোর রাতে বলির জায়গাটা যেমন রক্তে ভেসে যায়, সেইরকম চাপ-চাপ রক্তের মধ্যে ডাক্তার ঘোষরায় চিতপাত হয়ে পড়ে আছেন। মুখখানা কাগজের মতো সাদা। ভুরু সামান্য কোঁচকানো, চোখ বন্ধ। হাতদুটো গায়ে-গায়ে সমান্তরালভাবে লম্বা। ডান হাতটা সামান্য যেন মুঠো করা, আঙুলের ফাঁকে চেনসুদ্ধু একটা চাবির রিং জড়িয়ে আছে।

সুনন্দ একবারে সব দেখছিল না, একটু-একটু করে, টুকরো-টুকরো করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল। নইলে এরকম ক্ষতবিক্ষত শরীরে এত ঘটনা, এত কিছু দেখবার থাকে যে ধাঁধা লেগে যায়। কোন্‌টা যে স্বাভাবিক কোন্‌টা অস্বাভাবিক ধরা যায় না।

কমলকাকু নিচু গলায় বললেন, "পুলিশের রিপোর্ট, ডাক্তারবাবু চাবি বের করে যখন দরজা খুলতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মাথার পিছন দিকে ভারী কিছু দিয়ে খুব

জোরে আঘাত করা হয়, সেই আঘাতেই উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।"

"মাথার পেছনে তা হলে আঘাতের চিহ্ন আছে?"

"হ্যাঁ, একটা থ্যাঁতলানো ক্ষতচিহ্ন। ফুলে আছে জায়গাটা। দুই কানের ওপরের প্রান্ত বরাবর একটা সুতো ধরলে মাথার পেছনে যে জায়গাটা স্পর্শ করে সেই লেভেলে।"

বাঁ হাতে একটা জাপানি ঘড়ি। সুনন্দ ঝুঁকে পড়ে দেখল। ঘড়ির তলায় বাসের টিকিট গোঁজা। ভদ্রলোক অন্তত বারো-চোদ্দ ঘণ্টা আগে মারা গেছেন, কিন্তু ঘড়িটা এখনো জ্যান্ত, চিক-চিক করে চলছে। ব্যাপারটা ভাবলে গায়ের ভেতর যেন কেমন করে ওঠে।

মাঝারি হাইটের বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা ভদ্রলোকের। পরনে সাদা টেরিলিনের হাফ শার্ট আর ফ্যাকাশে ছাই রং টেরিকটন প্যান্ট রক্তের একগাদা ছোপ লেগে বাটিক প্রিন্টের মতো দেখাচ্ছে। খুন ব্যাপারটাই ভয়ঙ্কর। কিন্তু ধারালো অস্ত্র দিয়ে যে-ভাবে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ভদ্রলোককে হত্যা করা হয়েছে সেটা অমানুষিক এবং বীভৎস। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক আঘাত করা হয়েছে।

কমলেশ চ্যাটার্জি বোধহয় সুনন্দর দৃষ্টি অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। কারণ ঠিক এই সময় তিনি তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "হিটিং পয়েন্ট ন-টি। ন-টি মোক্ষম জায়গায় আঘাত করা হয়েছে। এর যে-কোনো একটি জায়গার আঘাতই ফেটাল, মানুষের অব্যর্থ মৃত্যু ঘটাতে পারে।"

সুনন্দ মুখ তুলে বলল, "খুনিরা পাগলের মতো এলোপাথাড়ি ছুরি চালিয়েছে।"

কমলকাকু হাসলেন, "ঝট করে কথাটা বলা তোমার ঠিক হল না লিট্‌ল ডিটেকটিভ। ছুরি একাধিক হাতের কাজ কি একজনের তা বলতে পারব না। তবে যে-যে বা যারাই ও কাজ করে থাকুক তারা যে এলোপাথাড়ি ছুরি চালায়নি একথা বলতে পারি।"

সুনন্দ জিজ্ঞাসু চোখে ওঁর মুখের দিকে তাকাল।

কমলেশবাবু বললেন, "তোমার অবশ্য দোষ নেই, তুমি তো আর অ্যানাটমি পড়োনি। মানুষের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান থাকলে বুঝতে চিবুকের হাড় যেখানে কানের লতি বরাবর শেষ হয়েছে, কণ্ঠনালীর দুপাশে সেখানে আঘাত করে ইন্টারনাল ক্যারোটিভ আর্টারি কাটা হয়েছে। তৃতীয় আঘাতটা বাঁ দিকের পাঁজরে ফোর্থ আর ফিফ্‌থ রিবসের ফাঁকে কোস্টাল কার্টিলেজ বরাবর। তার মানে নির্ভুলভাবে হৃৎপিণ্ড ভেদ করা হয়েছে। চার নম্বর আঘাত ডান দিকের পাঁজরের তলা ঘেঁষে সটান লিভারে। পাঁচ আর ছ নম্বরের আঘাত দুটোই সবচেয়ে গভীর, ও দুটো কিডনিতে পৌঁছেছে। তারপর ঠিক নাভিমূলে স্ট্যাব করা হয়েছে। ওখানেই অ্যাবডোমিনাল অ্যাওরটা নামে প্রধান রক্তবাহী শিরাটা আছে। কটা হল?"

"সাতটা।" সুনন্দ বলল, "আরও দুটো জায়গা আছে—দুই কুঁচকির কাছে তলপেট ছুঁয়ে!"

"ইয়েস। ফিমোর‍্যাল আর্টারি। আর একটা জিনিস তোমাকে লক্ষ করতে বলব। শার্ট আর প্যান্টের ওপরে ছুরির কাটিং, পরিষ্কার সরাসরি, বেশ ঠাণ্ডা হাতে, যেন নব্বুই ডিগ্রি কোণ করে, হাতুড়ি ঠুকে পেরেক বসানোর মতো ছুরির ফলা বসেছে। একটুও বাড়তি কাপড় কাটেনি, স্ট্রেট জামা-প্যান্ট ভেদ করে সমান মাপে স্কিন টিসু মাস্‌ল্‌ ভেদ করে ঢুকে গেছে।"

"এবার বুঝতে পেরেছি কমলকাকু," সুনন্দ ধীরে-ধীরে মাথা দোলাল, "মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পরে আঘাতগুলো করা হয়েছিল। বসা কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় নয়। তাহলে ফিনকি দিয়ে বেরনো রক্ত ছিটকে যেত। কিন্তু এখানে

দেখুন সমস্ত রক্তের ধারাগুলোই গা থেকে মেঝের ওপর গড়িয়ে গেছে।"

"রাইট। তোমার দেখা শেষ হয়েছে? এবার ওঁদের আসতে বলব?"

"আর এক মিনিট।" সুনন্দ মনোযোগী পড়ুয়ার মতো আবার যেন তার পড়ার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল। মাথার চুল থেকে একেবারে জুতোর ডগা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে যেতে-যেতে কীরকম এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কোথায় যেন কিছু গোলমাল আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। ওপর থেকে নীচে, নীচে থেকে ওপরে চোখ বুলোতে গিয়ে কীরকম খটকা লাগল দু জায়গায়। একটা হাতের ঘড়িতে, অন্যটা পায়ের জুতোয়। কিছু একটা, যেন যা হওয়া উচিত নয়, থাকা উচিত নয় তেমন কিছু, চোখ ধরে ফেলেছে কিন্তু মন পারছে না যেন। কিংবা তার উলটোটাই। মন খুঁজে পেয়েছে কিন্তু চোখ অন্ধ, নাচার।

কমলেশকাকা মৃদুগলায় বললেন, "বুঝেছি, তোমার কোথাও খটকা লেগেছে অথচ ধরতে পারছ না, কেমন তাই তো?"

"হ্যাঁ, ছাপা অক্ষরে ভুল বানান চোখ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলে যেমন অস্বাভাবিক লাগে, তেমনি।"

"কিন্তু ডেডবডি তো আর বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না।"

"থাকগে, আপনি ওদের বলে দিন।"

"দাঁড়াও! একটা কাজ করা যায় অবশ্য। যদিও একপ্রস্থ ছবি নেওয়া হয়ে গেছে, তবু তুমি যদি বলো আরও দু-চারটে শট নেওয়া যেতে পারে। পরে সেই ছবির এনলার্জমেন্টগুলো দেখলে তোমার কিছু মনে পড়তেও পারে। তাছাড়া ব্যাপারটা ডকুমেন্ট হিসেবে তখন কাজে লাগবে। কোন্-কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নিতে হবে, বলো।"

একটু চিন্তা করে সুনন্দ বলল, "হাত-ঘড়ি আর জুতোজোড়ার ছবি তুলিয়ে দিন। খুব কাছে থেকে। যেমন পরা আছে তেমনি থাকবে কিন্তু।"

"ঠিক আছে, গোটা-দুই ক্লোজ-আপ শট নিতে বলে দিচ্ছি।"

॥ ৪ ॥

বেশ চনচনে খিদে নিয়ে সুনন্দ বাড়ি পৌঁছল। কমলেশকাকা আসতে পারেননি, তবে গাড়ি দিতে চেয়েছিলেন, ও নেয়নি। এইটুকুন তো পথ।

কিন্তু বাড়ি পৌঁছে দেখে বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। ব্যাপারটা অবশ্য তারই অন্তর্ধান নিয়ে। দুধের গ্লাস ফেলে ছেলেটা সাত-সকালে কোথায় গেল। অচেনা কে এসে ডাকল অমনি তার সঙ্গে হুট করে চলে যাওয়া, এ তো ভাল কথা নয়। কাগজে মাঝে-মাঝে ছেলেধরার যে সব গল্পো বেরোয় তাতে কিছুই আর আশ্চর্য নয়। নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। মা ঘর-বার করছিলেন এমন সময় ওপাশের বাড়ির এক ভদ্রমহিলা খবর দিয়ে গেলেন। সুনন্দকে নাকি পুলিশে

ধরে নিয়ে গেছে। তাঁদের বাড়ির সামনেই পুলিশের গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল, তিনি স্পষ্ট দেখেছেন। তিনি কী দেখেছেন তাও জানিয়ে গেছেন।

মা এসে জড়িয়ে ধরলেন কাঁদতে-কাঁদতে, "কী সর্বনেশে ছেলে রে তুই! পুলিশের সঙ্গে নাকি মারপিট করেছিস?"

মায়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে খুব ছোট্ট বেলার মতো আদর খেতে-খেতে সুনন্দ বলল, "কার কাছে কী শুনেছ তার ঠিক নেই।"

"আমাকে যে বলেছে সে মিছে বলবে না, জেনে রাখো। কিন্তু তুই আমার গা ছুঁয়ে সেই কাজই করছিস!"

"ওঃ বুঝেছি, তুমি সেই পুলিশ টেস্ট করার কথা বলছ। তা মিথ্যে বলব না, খেয়েছি, এক কামড় পুলিশ খেয়েছি, মা।"

"অ্যাঁ?" মা আঁতকে উঠলেন, "পুলিশ কি খাদ্য নাকি?"

"এই যে গুণধর ভাই। এই যে দুধের শিশু, এটা কে খাবে! তুমি না আমি?" ভজাদা সেই দুধের গ্লাসটা নিয়ে যেন তাড়া করে ছুটে-যাওয়া শিকার ধরতে এসেছে। মুখের ভাবখানা তেমনই।

"এখন দুধ খাব কী! ইস্কুলে যেতে হবে না?"

"উঁহু সেটি বোধ হয় হচ্ছে না। বাবু বললেন, আর ইস্কুল যেতে হবে না।"

সুনন্দ চিন্তিত গলায় বলল, "শুধু আজকের জন্যে তো?"

ভজাদা হাসি চাপল ভেতরে ভেতরে, "তা আমি কী জানি! যেমন শুনেছি বললাম।"

মা বললেন, "হ্যাঁ, সেই ভাল, ওপরে গিয়ে বিশ্রাম কর। আমি জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

খাতা-কলম নিয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে লিখতে বসে গিয়েছিল সুনন্দ। কী লিখছিল সে জানে না, তবে তার বাবা যেমন করে গল্প লেখেন অনেকটা সেই রকম ভাবেই আরম্ভটা করেছিল। তার আজকের অভিজ্ঞতার কথা, খুঁটিনাটি দেখা এবং সেই সঙ্গে যে-সমস্ত প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক টুকরো চিন্তা এসেছে, কথার সূত্রে তার আর কমলেশকাকার মুখ দিয়ে যে-সব মন্তব্য বেরিয়ে এসেছে, ভুলে যাবার আগে সেই সমস্ত কিছুকে কাগজে-কলমে ধরে রাখা দরকার।

একটু ভেবে নিয়ে সুনন্দ লিখল, মৃতদেহের কি কোনো ভাষা আছে? মড়া কি কথা বলতে পারে? পারে। সে নিঃশব্দে কথা বলে। তার চোখে, মুখে, ক্ষতস্থানে, পোশাকে, সঙ্গের জিনিসপত্রে অনেক কথা লেগে থাকে। তার পতনের জায়গা অর্থাৎ মৃত্যুস্থল, তার আশ্রয়, তার বাসস্থল কিছুই বোবা নয়!

ডাক্তার ঘোষরায় কী বলছেন শোনা যাক। তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। একা। একাই কি? তাঁর হাত-ঘড়ির তলায় দুখানা টিকিট ছিল। পরপর সিরিয়ালের দুখানা টিকিট। একই ভাড়ার। অর্থাৎ তিনি ধর্মতলা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সঙ্গে কি কোনো লোক ছিল, তাঁর পরিচিত বন্ধুজন কেউ? সে লোকটি কি ঘোষরায়ের বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল একসঙ্গে? নইলে মিনি বাসের দুখানা টিকিট কেন হাতঘড়ির তলায় গোঁজা ছিল? তিনি এসে ডোর-ল্যাচ খুলতে গেছেন এমন সময় কেউ পিছন থেকে তাঁর মাথায় আঘাত করে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। তখন আততায়ী বা আততায়ীরা নির্মম ভাবে তাঁর শরীরে আঘাত করে, তা হলে? মনে হয় তিনি একাই ছিলেন। তাঁর পকেটে রাখা যা-যা পাওয়া গেছে সেগুলো কি কিছু বলতে চায়? এক নম্বর মানিব্যাগ। দুই, একটা বল পেন। এছাড়া রুমাল আর পকেট-চিরুনি। ব্যস, এই চারটে জিনিস। মানি-ব্যাগের মধ্যে দশ টাকা আর পাঁচ টাকার নোট

খান-কয়েক। বলার কিছু নেই, কিন্তু কোনো খুচরো পয়সা কেন নেই ? যদি তিনি তাঁর সঙ্গীর টিকিট কেটে থাকেন, যদি কেন তিনি নিশ্চয় কেটেছেন, তাহলে দুটো টিকিট মিলিয়ে দু টাকা তিরিশ পয়সা লেগেছে। বাকি পয়সা কোথায় ? হ্যাঁ, হতে পারে খুচরো পয়সা তিনিই দিয়েছেন। তাহলে তো চুকেই গেল, কিন্তু বল পেনটার রিফিল ফুরনো কেন। ভুল করে কি ওই অকেজো কলমটা পকেটে গুঁজেছিলেন ? তিনি কি খুব ভুলো স্বভাবের মানুষ ছিলেন ? ছিলেনই তো, নইলে পকেটে নস্যির কৌটোটা ছিল না কেন ? হ্যাঁ, তিনি নস্যি নিতেন। শোনা গেছে, ওই একটা মাত্রই নেশা তাঁর ছিল। অথচ কৌটোটা টেবিলের ওপরে ফেলে বেড়াতে বেরোলেন তিনি।

কমলকাকু প্রায়ই একটা কথা বলেন, যে-কোনো অপরাধের ঘটনাস্থলই অপরাধের আই উইটনেস। অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অকুস্থল, সেই জায়গাটাই তাহলে অপরাধের চক্ষুষ্মান সাক্ষী। প্যাসেজের ওপরে অবশ্য বাড়তি কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই একমাত্র রক্তের দাগ ছাড়া। কিন্তু যেখান থেকে তিনি শেষ যাত্রা করেছিলেন সেই বসবার ঘর কি কিছুই দেখেনি ? থাকুক দরজা বন্ধ, কিন্তু প্যাসেজের আর ঘরের মধ্যে মাত্র একটা কাঠের দরজার ব্যবধান।

ঘরখানা বড়সড়, ছিমছাম। দেওয়ালে একটা প্রমাণ সাইজের মানুষের রঙিন মানচিত্র। মানে অ্যানাটমি। ঘরের প্রথম অর্ধেক জুড়ে সোফা সেট, তলায় পুরু গালচে। অন্যদিকে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল গ্লাসটপ দেওয়া, সামনে এক লাইনে তিনটে অতিথি চেয়ার কাঁধ খাড়া করে বসে আছে। কর্তার নিজের চেয়ারটা রিভলভিং। একটা কাঁচের দেওয়াল, আলমারির মধ্যে সারি সারি সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সাজানো স্টেনলেস স্টিলের ছুরি কাঁচি ফরসেপ নানা সাইজের, নানা আকৃতির। ভেতরের ঘরে যাবার দরজার পাশে প্রকাণ্ড আকারের ক্যালেণ্ডারের তলায় টিপয়ের ওপর টেলিফোন।

ঘরখানা এক কথায় টিপটপ, বোবা।

আঁতিপাঁতি খুঁজেও এমন কিছু পাওয়া গেল না যেটা আসন্ন বিপর্যয়ের আগাম সূত্র দিতে পারে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারবার চারপাশে তাকিয়েও অস্বাভাবিক, খাপছাড়া কিছু আবিষ্কার করা গেল না। বাজে কাগজের ঝুড়িতে কিছু ড্যালা-পাকানো চিঠিপত্র। বাতিল জিনিস। সেগুলো খুলে-খুলে দুমড়ানো কোঁচকানো কাগজ টান-টান করে চোখ বুলোনো হল। নিরীহ নিরুত্তাপ সে-সব চিঠি, কোনো রহস্য নেই।

গোটা-দুই ইনল্যাণ্ড লেটার টেব্‌ল ম্যাট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল চা খাবার সময়। বোধহয় সেণ্টার টেবিলের পালিশ নষ্ট হবার ভয়ে। আমার খুব মজা লেগেছিল চায়ের ডিশের দাগ দুটো দেখে। দুটো বৃত্তের ব্যাস এক রকমের নয়, একটি চক্কর বড়, রেখাটা সরু এবং ফিকে। ছোট চাকাটা মোটা আর গাঢ়। দুটোই নিশ্চয় চায়ের কাপের ডিশ, গেরুয়া রঙের দাগ দেখে বোঝাই যায়। তাহলে এতটা তফাত, এতটা ছোট-বড় কেন ? কমলকাকুকে কথাটা বলতেই তিনি চিঠিদুটোর দিকে এক পলক তাকিয়ে হেসে ফেললেন, 'আপনি মাঝে-মাঝে একটু বোকা হয়ে যান মাস্টার শার্লক হোমস, তখন খুব সরল ব্যাপারও আপনার নজর এড়িয়ে যায়। আসলে এই চায়ের দাগদুটো এই গল্পই বলছে যে, দুটো মানুষের জন্যে চা এসেছিল। কিন্তু একজন তখন বাথরুমে কিংবা অন্য কোনো কাজে আটকে গিয়ে টেবিলে আসতে দেরি করছিল বলে তার চায়ের কাপটার মাথায় ডিশ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে করে ঠাণ্ডা হয়ে না যায়। কাপের তলার রিং ডিশের রিং-এর থেকে ছোট হয়, আর ডিশের ওপরে অনেক সময়ই চা চলকে পড়ে থাকে বলে শুধু

কাপটা কাগজের ওপরে মোটা দাগ ফেলেছে, আর ডিশের ছাপটা আকারে বড় আর সরু আর ফিকে। কেমন, সে রকমই তো হবার কথা ?'

শার্লক হোমস ওরফে সুনন্দ ওরফে আমি লজ্জিত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লাম। কমলকাকু মাঝে-মধ্যে এরকম ঠাট্টা করেন। কখনো হোমস, কখনো ব্যোমকেশ, কখনও প্রতুল লাহিড়ী নাম দিয়ে আপনি আজ্ঞে করে আমার সঙ্গে কথা বলেন। খুব সিরিয়াস ব্যাপার যখন মগজে জট পাকিয়ে তোলে তখন ওঁর এই রঙ্গ-রসিকতার হালকা মেজাজ হাওয়া বদল করে দেয়। ফলে তরতর করে আমার বুদ্ধি খুলে যায়, কোনো কিছুকেই আর আগের মতো শক্ত লাগে না।

আজও, এই মুহূর্তে তাই হল।

আমি জলের মতো এই চায়ের দাগের ইতিহাস বুঝে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে আরও এমন একটা জিনিস, জিনিস না বলে সূত্র বলাই ভাল, আবিষ্কার করে ফেললাম যা দেখতে পেলে কমলকাকু লাফিয়ে উঠে আমার পিঠ চাপড়ে দিতেন। কিন্তু না, এখন আমি ব্যাপারটা চেপে যাব, ওঁকে বলব না। যথা সময়ে আমার হাতের তাস দেখিয়ে চমকে দেব। আমি ওঁর অলক্ষ্যে চিঠিদুটো ভাঁজ করে নিজের পকেটে চালান করে দিলাম। কেন জানি না, আমার কেবলি যেন মনে হতে লাগল এই খুনের ব্যাপারটার কোথাও একটা বড় রকমের ধাপ্পা আছে। এর ঘটনাগুলো কেমন যেন সাজানো।

এই পর্যন্ত লিখে সুনন্দ থামল। তার আঙুলগুলো টন-টন করছে। লেখার ঝোঁকে একটানা অনেকখানি লিখে ফেলেছে সে। বোধহয় পরীক্ষার খাতায় ছাড়া কখনো একবারও না থেমে এতটা লেখেনি। তাছাড়া মাথাটাও ফাঁকা হয়ে গেছে, আর কিছু আপাতত ভাবা হয়নি।

পর্দা সরিয়ে ভজাদা মুখ বাড়াল, "ছোট মাসি ডাকছেন।"

"এসেছেন ? কই, কোথায় ?" সুনন্দ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

"উঁহু, ফোন।"

কমলেশকাকা সেই এলেন, দুদিন পরে। এই দুটো দিন সুনন্দ মনে মনে তাঁর আসার অপেক্ষায় ছিল। দ্বিতীয় দিনে বার কয়েক তাঁকে ফোনে পাবার চেষ্টাও করেছে কিন্তু পায়নি।

কিন্তু মানুষটা যেন বাড়ি থেকে, অফিস থেকে, বোধহয় কলকাতা শহর থেকেই উপে গিয়েছিলেন। কেউ তাঁর হাল-হদিসের সন্ধান দিতে পারেনি। মনে মনে কিঞ্চিৎ অভিমানই হয়েছিল সুনন্দর। নিজে আসতে না পারুন একটা খবর তো পাঠাতে পারতেন। যেখানেই থাকুন একটা ফোন করা কিছু শক্ত ছিল না। শহর জুড়ে এ রকম খুনোখুনি চলেছে, খবর না পেলে দুশ্চিন্তা হওয়া তো কিছু অস্বাভাবিক নয়। একটা গুপ্ত দল এখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা প্রায় নির্বিচারে পুলিশের লোককে খুন করছে, বন্দুক-টন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আসলে জটিলতাটা যেন রাজনৈতিক কারণেই। রাজনীতির ছোঁয়া থাকলেই অনেক গুরুতর ব্যাপার শেষ পর্যন্ত ধামা-চাপা পড়ে যায়, আর এগোয় না। ডাক্তার ঘোষরায়ের কেসটাও তেমনি। বোধহয় থিতিয়ে এসেছে। তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ যেই রাজনীতির গন্ধ পেয়েছে, অমনি চুপ। এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই বিসর্জন।

সুনন্দ এই দুদিন কিন্তু বসে থাকেনি, সর্বক্ষণ ওই খুনের ঘটনা নিয়েই ভেবেছে। তার তদন্তের খাতায় ইতিমধ্যে আরও কয়েক পাতা লেখা হয়েছে। চিন্তা ভাবনা যখন যেমন মনে এসেছে লিখে গেছে। তাছাড়া শুধু খাতায় কলমেই নয়, বার কয়েক সে মাসির বাড়িতে যাবার ছুতো করে পাড়ার মিনি বাসের গুমটিতে হানা দিয়েছে,

ডাক্তারবাবুর বাড়ির আশপাশও ঘুরে এসেছে। ও বাড়িতে এখন সুনীতিকুমার একা নেই, ডাক্তারবাবুর ভাইপো-ভাইঝিরা সপরিবারে আসায় বাড়ি ভরে গেছে। গোটা-কতক বাচ্চা-কাচ্চাও এসেছে। শোনা যাচ্ছে শ্রাদ্ধটা ওই বাড়িতেই হবে। তারপর যে যার মতো চলে যাবে। ও বাড়ির পাট খুব সম্ভব তুলে দেওয়া হবে।

আসলে ডাক্তার ঘোষরায় তাঁর জীবিকায় খুব সফল ছিলেন না। তাঁর প্র্যাকটিস জমেনি কোনো দিনই। এক-একজন মানুষের এ রকম কপাল থাকে, পয়সা হয় না। অথচ ডাক্তার হিসেবে তিনি নাকি অযোগ্য ছিলেন না। অন্য ডাক্তাররা যেখানে পনেরো-বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা রোজগার করে থাকেন, তাঁর রোজগার সেখানে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকার বেশি ছিল না। অত দূরের কথায় কাজ কী, তাঁর ওই ডাক্তার ভাইপোটিই হাসপাতাল আর প্রাইভেট প্র্যাকটিসে মিলিয়ে মাসে প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা রোজগার করেন। নিজের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। তার ওপর ওঁর স্ত্রীটিও কোনো এক বড় স্কুলের শিক্ষিকা।

চিল্লাকোঠায় বসে এইসব সাতপাঁচ ভাবছিল। কমলেশকাকু কখন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ও বুঝতেই পারেনি। গলা শুনে চমকে ফিরে তাকাল সুনন্দ।

"এই কমলেশকাকু, আপনি বেশ লোক।"

"নিশ্চয়ই। শুধু আমি কেন, তুমিও বেশ লোক। আমরা সবাই বেশ লোক।"

গলায় অভিমান ফুটিয়ে সুনন্দ বলল, "আমি তা বলে আপনার মতো ভ্যানিশ হয়ে যাই না।"

"ওঃ এই ব্যাপার? তা তোমার রাগ করবার অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু জানো তো ওটা মহাপুরুষদেরই একটা লক্ষণ। তাঁরা থেকে থেকেই ভ্যানিশ হয়ে যান। যাক, তোমার হোমটাস্ক কতদূর এগোল?"

এই কথাটা শোনার জন্যেই সুনন্দ অপেক্ষা করে ছিল। ঘরে বসে রহস্যের জট ছাড়ানোর কাজটাকে উনি মজা করে হোমটাস্ক বলেন। সত্যি আজ দুটো দিন যেন আলুনি বিস্বাদ লেগেছে, উত্তেজনা হঠাৎ মিইয়ে গেলে এ রকম হয়। কমলেশকাকার এই একটা কথায়ই সে চাঙ্গা হয়ে উঠল। বলল, "সামান্য। কিন্তু তার আগে পুলিশের খবর বলুন।" একটা চেয়ার টেনে এনে ঝাড়ন দিয়ে মুছে দিল, "এখানে বসুন।"

"খোঁজ-খবর নিয়ে পুলিশ অবশ্য তার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। প্রথম দেখে যেমন মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত তাই, পলিটিক্যাল মার্ডার। ক্রাইম স্টাইলটা সেই এক। তাছাড়া, যাকে বলে মোটিভ তা কই এখানে? অর্থের জন্যে এই খুন হয়নি, প্রতিশোধ নেবার জন্যেও নয়। কোনো পুরনো শত্রুতা, রেষারেষি কিংবা ঘৃণার কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। হোমি সাইড ডিপার্টমেন্টের মতে পার্সোনাল মার্ডার যখন নয়, তখন জনসাধারণের-মনে ত্রাস সঞ্চার করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। শহরে গ্রামে গঞ্জে তো এরকম আকচারই ঘটছে।"

সুনন্দ কেমন যেন একটু হতাশ হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, "কিন্তু ডাক্তারবাবুর মৃত্যুতে কারো কি কোনো নগদ লাভ হচ্ছে না?"

"তা নিশ্চয়ই হচ্ছে। তবে ওঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ তেমন কিছু নয়। হাজার-তিরিশেক টাকা আছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। আর সল্ট লেকে দু কাঠা জায়গা। চিট ফাণ্ডে কিছু টাকা ঢেলেছিলেন, সে টাকা জলে গেছে। হাজার পনেরো টাকার লাইফ পলিসি আছে অবশ্য, সেটার উত্তরাধিকারী সুনীতিকে করে গেছে। জমি আর টাকা ভাইপো আর দুই ভাইঝির মধ্যে ভাগ হবে নিশ্চয়।

কার্নিচারগুলো হয়তো ওরা সুনীতিকেই দিয়ে যাবে। সুতরাং বুঝতে পারছ, কেউই খুব কিছু পাবে না।"

"হুঁ। এই অর্থের জন্য কেউ কারো মৃত্যু চায় না।"

"মৃত্যু চাইলেও হাতে-কলমে খুন করার ঝুঁকি নিয়ে চায় না। বিশেষ করে কেউ যখন অ্যাকিউট অর্থকষ্টে ভুগছে না। ভাইপো-ভাইঝিদের অবস্থা তো রীতিমত ভাল। তাছাড়া তারা সবাই দূরের মানুষ, বছরে একবার দেখা হত কিনা সন্দেহ। কাছের মানুষ বলতে একমাত্র ঐ ভাগ্নে, যার পক্ষে কিছু করা ফিজিক্যালি সম্ভব ছিল। কিন্তু সেও মোটামুটি ভদ্রগোছের মাইনেই পায়। একা মানুষ। তাছাড়া ডাক্তারবাবু, সে নিজেই স্বীকার করেছে, সংসার খরচের জন্যে একটা পয়সাও নিতেন না। লোকসানটা সেদিক থেকে তারই হল। সুতরাং বুঝতে পারছ, এই খুনের পেছনে টাকা-পয়সার কোন ব্যাপার নয়। খুনিরা ওঁর টাকা পয়সা ছুঁয়েও দেখেনি। আলমারিতে হাজার-দেড়েক টাকা যেমন ছিল তেমনি আছে। আঙুলে হিরের আংটি পর্যন্ত। ঘরের জিনিস কাগজপত্র কিছুই ঘাটেনি। ইন ফ্যাক্ট, ঘরের মধ্যে বাইরের লোক কেউ ঢুকেছিল তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"

"তা হলে এটা, পলিটিক্যাল মার্ডার ছাড়া কিছু নয়?"

"সে বিষয়ে কি তোর সন্দেহ আছে? এই দ্যাখ।" কমলেশকাকা পকেট থেকে একখানা ইনল্যানড বের করে দেখালেন। টাইপ করা চিঠি, ইংরেজিতে। আগাগোড়া লাল কার্বনে ছাপা। সুনন্দ ঝুঁকে পড়ে পড়ল। ভাল বুঝতে পারল না।

"কী এটা কাকু? এ সব কী লিখেছে?"

"এটা ডক্টর ঘোষরায়ের ডেথ ওয়ারেন্ট। মৃত্যুর পরোয়ানা। কোনো গুপ্ত দলের অ্যাকশান স্কোয়াড এই চিঠি লিখেছে। তাদের ধারণা ডাক্তার গোপনে-গোপনে পুলিশের স্পাই। সেই কারণে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছে।"

"চিঠিটা কোথায় পেলেন?"

"ওয়ার্ডরোবের মধ্যে ওঁর একটা জামার পকেটে। ডাকে এসেছিল, তিন-চারদিন আগে।"

"আচ্ছা কমলকাকু, পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ। তোকে আর জানাবার সুযোগ পাইনি। সন্ধে সাড়ে-ছটা থেকে সাতটার মধ্যে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে মোটা লোহার রড জাতীয় কিছু দিয়ে জখমে প্রথমে আঘাত করা হয়। তারপর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। প্রথম ছুরির আঘাত হয়েছিল হৃৎপিণ্ডে, ফলে সঙ্গেসঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে। আততায়ীকে কোনো রকম বাধাই তিনি দিতে পারেননি।"

সুনন্দ মাথা চুলকে বলল, "কাকু, আমার কিন্তু মনে হয়"—কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ কেমন চমকে উঠল ও। মনে হল আচমকা কোনো একটা কথা কিংবা চিন্তা তার মনের মধ্যে স্পার্ক দিল। ইলেকট্রিক শক খেলে মানুষ যেমন কিছু সময়ের জন্য কী রকম বোকা আর বোবা হয়ে যায় তার অবস্থা সেই রকম। চোখদুটো উজ্জ্বল বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে, এক দৃষ্টিতে সে কমলেশকাকার দিকে তাকিয়ে আছে।

কমলেশ ওর কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে বললেন, "কী হল? কী হয়েছে, এই!"

সুনন্দ ধড়মড় করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, "হয়েছে! পেয়েছি! মনে পড়েছে! ইস, আমি কী বোকা!"

"এ রকম করলে তো আমি কিছুই বুঝতে পারব না, সুনন্দ! কী মনে পড়েছে খুলে বলো!"

সুনন্দ ধপ করে তার চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "সেদিন ডেড বডি দেখতে দেখতে আমার কিসে যেন খটকা লেগেছিল,

তোমার মনে আছে ?"

কমলেশকাকারও সঙ্গে সঙ্গে কী যেন মনে পড়তেই বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ,ভাল কথা মনে পড়েছে—তোর সেই ছবি দুখানা আমি নিয়ে এসেছি। সেই জুতো আর ঘড়ির ছবি।"

"এনেছ ! সত্যি এনেছ !" আবেগের ঝোঁকে কমলকাকুর হাত জড়িয়ে ধরে সুনন্দ বলল, "ওয়াণ্ডারফুল ! কই দাও, দাও, আগে ছবি দেখি—"

"সে তো আমার ব্যাগে আছে। তুই এক কাজ কর, ভজহরিকে আমার অ্যাটাচিটা নিয়ে আসতে বল দিকি।"

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সুনন্দ অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে ফিরে এল। তার আর যেন তর সইছে না। অ্যাটাচি খুলে প্লাস্টিকের একটা বড় খাম বের করলেন কমলেশ। তার ভেতর থেকে এক গোছা এনলার্জ করা ফোটোগ্রাফ বেরল। উনি তার থেকে দুখানা ছবি বেছে নিয়ে বললেন, "নে ধর। এই দুখানা তোর।"

ছবির ওপরে সুনন্দ প্রায় হুমড়ি খেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত।

তার পর চাপা উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "দেখুন তো ছবি দুটোয় কিছু, মানে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কি না।"

কমলেশ ছবি দুখানা হাতে নিতে নিতে বললেন, "আর আপনি নয়, তুমি। একটু আগে মুখ ফসকে যেমন বলে ফেলেছিলি। ওর চেয়ে মিষ্টি, ওর চেয়ে আপনার আর কিছু হয় না। কই আমি তো কিছু না, অস্বাভাবিক কিছু তো ইয়েস ইয়েস, রাইট ! ঘড়িটা উলটো করে পরা, মানে ঘড়ির চাবিটা আঙুলের দিকে না থেকে হাতের ওপরের দিকে মুখ করে আছে। বাট হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন ? বে-খেয়ালি যে কেউ উলটো করে পরে ফেলতে পারে, আমারই কতদিন হয়েছে, পরে সোজা করে নিয়েছি।"

"জুতোর ছবিটা দ্যাখো—" সুনন্দ মুচকি হেসে বলল।

একটু বেশি সময় ধরে ছবিটা দেখতে হল কমলেশকে, তারপর মাথা নাড়লেন, "না বাবাজি, এখানে ফেল করলাম। এর মধ্যে অড্ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একই পেয়ারের জুতো, দিব্যি সোজা করেই পরেছেন ভদ্রলোক। রঙে সোলে কোনো ফারাক নেই।"

"ফিতেটা," সুনন্দ যেন খেই ধরিয়ে দেয়।

"উঁহু, ঠিকই তো আছে।"

"না ঠিক নেই। ফিতের ফাঁস মানে লুপ দুটো দেখ., জুতোর ডগার দিকে, মুখ দুটো ওপরের দিকে হয়ে আছে। তার মানে কাকু, ফিতে উনি নিজে বাঁধেননি।"

"তার মানে ?" বড় বড় চোখে কমলেশ তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

"তার মানে আমি বলতে চাই, জুতো, ট্রাউজার সব ওঁকে পরানো হয়েছিল, কেউ পরিয়ে দিয়েছিল। কেন ? কেননা উনি বাইরে থেকে ফিরছিলেন না, বাড়িতেই ছিলেন। লুঙ্গি পরে আয়েস করে বসে ছিলেন হয়তো। মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে পোশাক পরানো হয়েছে। তারপর বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। দরজার চাবিটা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিনি বাসের টিকিট দুটো গুঁজে দৃশ্যটা রিয়্যাল করে তোলা হয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকের নেশার খবরটা হয়তো ভাল জানা ছিল না, তাই পকেটে নস্যির কৌটোটা ভরে দিতে ভুলে গেছে এবং আরও একটা ছোট ভুল করেছে—"

মুগ্ধ চোখে, তারিফের চোখে কমলেশ তাকিয়ে ছিলেন সুনন্দর দিকে। এবার হাত বাড়িয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "শাবাশ বেটা, শাবাশ ! তুই কামাল করে দিয়েছিস। বলে যা—"

সুনন্দ কিছু না বলে টেবল থেকে খাতাটা

তুলে নিয়ে ফরফর করে পাতা উলটে গিয়ে গিয়ে একটা জায়গা বের করে বলল, "এইখান থেকে পড়ে যাও, তোমার জন্যেই লিখে রেখেছি।"

প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে সুনন্দর ডায়েরিটুকু পড়ে কমলেশ যখন মুখ তুললেন তখন দৃষ্টি স্থির, চিবুকে দক্ষ শিকারির মতো একটা বাড়তি কাঠিন্য যোগ হয়েছে, ঠিক ট্রিগার টেপার আগের অবস্থা। বললেন, "হুঁ! কেসটা এবার যেন নতুন করে দাঁড়াতে যাচ্ছে। ইনল্যাণ্ড দুখানার কী ব্যাপার? তার মধ্যে আবার কী রহস্য?"

সুনন্দ বলল, "রহস্য কিছু না, পোস্টাপিসের সিলমোহরের মধ্যে কিছু খবর আছে। চিঠিদুটোয় ওই দিনের বিকেল সাড়ে-চারটের ছাপ ছিল। তার মানে ও চিঠি বিলি হতে হতে পাঁচটা সওয়া-পাঁচটা। তারপর চিঠি খোলা হয়েছে, পড়া হয়েছে, চা খাওয়া হয়েছে। এ সব করতে, ধরেই নেওয়া যায় সাড়ে-পাঁচটা ছটা হয়েছিল। পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট অনুযায়ী সময়টা খুনের খুব কাছাকাছিই হবে।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও।" কমলকাকু বললেন, "ঘটনাগুলোকে পর পর স্বাভাবিক অবস্থায় সাজিয়ে নেওয়া যাক। পুলিশের রিপোর্ট—সুনীতি সিনেমা দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিল দুটো নাগাদ। তখনও ডাক্তারবাবু বাড়িতেই। বিষ্যুতবার, ওঁর ছুটির বার। আয়েস করে বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। সাড়ে তিনটে নাগাদ নাকি ওঁর কোথাও যাবার কথা ছিল। তা হলে ওই সময় যদি তিনি বেরিয়েও গিয়ে থাকেন, পাঁচটা নাগাদ তাহলে আবার ফিরে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল দুজন লোক। কেমন ঠিক তো?

"হ্যাঁ ঠিক। তবে লোক দুজন ওঁর সঙ্গে না এসে পরেও আসতে পারে।"

"হুঁ, বলে যা।"

"লোক দুটি পরিচিত, তাই ঘুণাক্ষরেও ত্যাকারী বলে সন্দেহ করেননি। হয়তো গল্পও জমে উঠেছিল। ওরা কিন্তু আগে থেকেই নির্ভুল অঙ্ক কষে এসেছিল। ওরা জানত সুনীতি বাড়িতে থাকবে না। তাছাড়া কাজটা সারতে সময়ও বেশি লাগবে না। আরও জানত, ওপরতলা ফাঁকা, প্যাসেজে খুনের সময় কেউ নেমে এসে বাগড়া দেবে না। তাছাড়া কাজটা সারতে সময়ও বেশি লাগবে না। পয়লা হাতিয়ার স্টেইনলেস স্টিলের রুলারটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরই আছে। এইখানে কাকু একটা কথা। রুলারটা তো ওইখানেই থাকবার কথা, তাই না? আলমারিতে সার্জিক্যাল নাইফের পাশে রুলারটাকে দেখে আমার কেমন খটকা লেগেছিল। পরে বুঝেছি ছুরিটা রাখবার সময় ওখানে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ওরা ভেবেছিল অত যন্ত্রপাতির মধ্যে ওটা কারও খেয়ালে আসবে না।"

"শাবাশ, বাহাদুর! গো অন।"

"খুনটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাকে একটা বিশেষ দলগত চেহারা দেবার জন্যেই ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার। ট্রেড মার্কের মতো অনেকগুলো স্ট্যাবিংয়ের মার্কাও দেওয়া হয়েছিল।" একটু দম নিল সুনন্দ, বলল, "কাপটা ঢাকা দিয়ে রেখে ডাক্তারবাবু যখন ফোনের কাছে উঠে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ডায়াল করছিলেন তখনই অতর্কিতে রুলারটা মোক্ষম আঘাতে নেমে আসে। কেন বলছি, আমি দরজার গা-তালার হাইটটা সে দিনই লক্ষ করেছিলাম। ডাক্তারবাবুর মতো মাঝারি উচ্চতার মানুষকে তালা খোলার জন্যে নিচু হয়ে দাঁড়াবার কোনো কারণ ছিল না।"

কমলেশকাকা সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে হাসলেন, "ঠিক হ্যায়, এই পর্যন্ত অন্তত ঠিক হ্যায়। কিন্তু তোর ওই দেড় মানুষের থিওরিটা মেনে নিতে পারছি না। বারো হাত কাঁকুড়ের মতো শোনাল।"

সুনন্দ অবাক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "দেড় মানুষের থিওরিটা কী?"

"ওই যে তিনজন মানুষ আর দু-কাপ চায়ের গপ্পো! কাপ প্রতি দেড় জন মানুষ

হল না কি ?"

"ও,এই প্রবলেম ? ঠিক আছে"—সুনন্দ সবজান্তার হাসি হাসল, "আমি তাহলে এবার আমার ওই দুজন লোককে উইথড্র করে নিলাম।"

"তাই নাও।" বলেই কমলেশকাকা ভুরু দুটো কপালে তুললেন, "কিন্তু তার মানে ?"

"মানে এই, ফ্ল্যাটে এখন বাইরের লোক কেউই থাকল না।"

"আপত্তি নেই, কিন্তু সেই এক কাপ চা কিন্তু বেশি হয়ে গেল। আবার সেই ভগ্নাংশ প্রবলেম।"

সুনন্দ একথা শুনেও ঘাবড়াল না। শিবরাম চক্রবর্তীর ধরনে কথায় প্যাঁচ লাগাল, "ভগ্নাংশের সঙ্গে ভাগনে অংশ যোগ করুন, মিলে যাবে। মনে করুন সুনীতিবাবু তখন ওই ফ্ল্যাটেই ছিলেন, মামার কাছে।"

"এত বড় একটা কথা বলে দিলেই তো হবে না। প্রমাণ কিছু হাতে আছে ?"

"আছে। ওটাই আমার হাতের তাস, কাকু। সব শেষের জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। তোমাকে এতক্ষণ তাই বলিনি। মিনিবাসের টিকিটদুটো এক দিনের বাসি। ওদুটো ধোঁকা লাগাবার জন্যেই। গুমটির টাইমকিপারবাবু আমার চেনা। খাতা দেখে বলেছেন।"

"বলিস কী !"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

কমলেশকাকা মিনিটখানেক গুম হয়ে বসে থেকে যেন আপনমনেই বললেন, "কিন্তু মোটিভ ? মোটিভ চাই, খুব স্ট্রং একটা মোটিভ।"

মাথা চুলকে সুনন্দ বলল, "সে আমি জানি না। ও ব্যাপারটা তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে, কাকু।"

কমলেশবাবু হেসে উঠলেন হা হা করে। তার পর বললেন, "লাস্ট এবং মোক্ষম প্যাঁচটা তুই তা হলে আমাকেই মারলি ? সাদা বাংলায় যাকে বলে ল্যাং !"

যোগাযোগটা ঘটে গেল আশ্চর্য উপায়ে, আচমকা। পথের মাঝখানে দেখা হয়ে যেতেই ছোটমাসি বললেন, "ভালই হল, তুইও চল্।"

"কোথায় ?" মাসির হাতের স্বচ্ছ নাইলনের ব্যাগটার ভেতরে এক গাদা ফল আর মিষ্টির প্যাকেট দেখা যাচ্ছিল। ডাক্তারের বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে ছোটমাসি বললে, "ওদের অশৌচ-হবিষ্যি চলেছে, এ-সময় এ-সব দিতে হয়।"

"ওদের কাদের ?" সুনন্দ চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞেস করে।

"ও হরি, তোকে তো জানানোই হয়নি। টাটানগর থেকে ডাক্তারবাবুর ভাইপো আর তার বউ এসেছে পরশুদিন। কী রকম নাটক দেখ, ওই বউটি, মানে প্রতিমা ছিল আমার ইসকুলের বন্ধু। আমি জানতামই না ওর স্বামী এই ডাক্তারবাবুর দাদার ছেলে ! কতকাল যোগাযোগ নেই তো ! ভাগ্যিস কাল রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। যাবি তো ?"

যাবে আবার না ! সুনন্দ তো মনে মনে এক পায়ে খাড়া হয়েই ছিল। কিন্তু তখনো কি জানত যে একটা দারুণ নাটক তাদের জন্যে ওই বাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করে আছে !

বার-দুই ডোর-বেল টিপে অপেক্ষা করেও যখন কোনো সাড়া পাওয়া গেল না তখন সুনন্দ কিছু না ভেবেই দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। দরজাটা ভেজানো ছিল বুঝতে পারা যায়নি। দড়াম করে বেমক্কা খুলে যেতেই সুনন্দ টাল সামলাতে পারল না। হুড়মুড় করে ভেতরে গিয়ে পড়ল।

হাত-পায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই সুনন্দর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বসবার ঘরের তিনখানা চেয়ারে তিনটি মনুষ্যমূর্তি তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। প্রথমে ভেবেছিল মরা মানুষ, কিন্তু না, তিনজনেই জলজ্যান্ত জিয়ন্ত, চোখের পলক পড়ছে কিন্তু মুখে ভাষা নেই। ঠিক যেন জাদুঘরের তিনটে মমি। ব্যাপারটা মগজে

ঢুকতে এবং তিন মূর্তিকে চিনতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল।

ডাক্তারবাবুর ভাগনে সুনীতিদা আর অপরিচিত এক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে কারা চেয়ারে বসিয়ে মুখ-হাত-পা বেঁধে রেখে গেছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠেই ছোটমাসি এগিয়ে এল, "এ কী ব্যাপার, প্রতিমা ? কী হয়েছে ? তোদের এ-দশা কে করল ?"

হাত-পায়ের মুখের বাঁধন খুলে দেবার পরে আসল ঘটনাটা জানা গেল। দু জন বন্দুকধারী যুবক বাড়ির ভেতরে আচমকা ঢুকে পড়ে ওঁদের এভাবে কাবু করে ফেলেছিল। তারপরই ওঁদের চোখের সামনে সারা বাড়ি হাঁটকে তন্ন-তন্ন করে কী যেন খুঁজে বেড়াল। যা খুঁজছিল তা বোধহয় পেল না। তখন যাবার সময় টাকা-কড়ি যেখানে যা পেল হাতিয়ে নিয়ে চলে গেল।

মিনিবাসের টিকিটদুটোর কথা আবার মনে পড়ল। টিকিটদুটোকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারা যাচ্ছে কি ? ডাক্তারবাবুর খুনের সময় কি তা হলে এরাই তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিল ? কী খুঁজতে এসেছিল ওরা ? টাকা না অন্য কিছু ? ওদের কথা শুনে নাকি মনে হয়েছে ওরা হতাশ হয়ে ফিরে গেছে, যা খুঁজতে এসেছিল পায়নি।

এই রকম এলোমেলো চিন্তায় সুনন্দ এতই অন্যমনস্ক ছিল যে, একটা কালো রঙের মোটর-গাড়ি যে তাকে অনেকক্ষণ থেকে অনুসরণ করে খুব ধীর গতিতে পিছন-পিছন আসছে সে খেয়ালই করেনি। খেয়াল হল তখন, যখন গাড়িটা তার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে কয়েক গজ সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল, গাড়ির মধ্যে জনা-তিন চার লোক। তাদের কেউ একজন স্পষ্ট গলায় বলল, "ওই তো,ওই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।"

সুনন্দ বুঝতে পেরেছিল এরা কোনো বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই বলল, "হ্যাঁ বলুন, আপনারা কাকে খুঁজছেন ?"

"ডকটর ঘোষরায়। তাঁর বাড়িটা চেনো ?" গাড়ির ভেতর থেকে অন্য একজন বলল, "আমরা নম্বর জানি না, আন্দাজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের সঙ্গে এসে তুমি যদি একবার দেখিয়ে দিতে—"

সুনন্দর জরুরি কাজ কিছু ছিল না, তাছাড়া গাড়িতে কতটুকুই বা সময় লাগবে। ভেতরে উঠে বসতেই পাশের লোকটি গাড়ির দরজা লক করে দিয়ে বলল, "কুইক !"

গাড়ি চোখের পলকে স্পিড নিল।

"উঁহু উঁহু, এ দিকে নয়—" বলতে গিয়েই সুনন্দ থেমে গেল। তার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। একটা বিতিকিচ্ছিরি দেখতে নাক-বোঁচা পিস্তল তার পাঁজরে ঠেসে ধরে পাশের যুবকটি বলল, "একটা শব্দ করেছ কি একেবারে শেষ করে দেব ! প্রাণে বাঁচতে যদি চাও বোবা কালা আর অন্ধ হয়ে বসে থাকো।"

গাড়িটা ততক্ষণে রাস্তা ধরেছে।

এখন শুধু নাক আর কান ভরসা। সুনন্দর মগজ চোখ ছাড়াই যতটুকু পারছে কল্পনায় দেখছে। গন্ধ আর শব্দ দিয়ে অন্ধরা যেমন দেখে। সুনন্দও এখন এক অর্থে অন্ধই। ওরা চোখের ডাক্তারের মতোই তুলোর প্যাড আর গজ-ব্যাণ্ডেজ দিয়ে চোখদুটো দিব্য টাইট করে বেঁধে দিয়েছে। ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে চলন্ত গাড়ির মধ্যেই ওরা কাজটা সেরে নিয়েছে। এখন কেউ দেখলে ভাববে ছেলেটার চোখে অপারেশন হয়েছে, অন্য কিছু সন্দেহই করতে পারবে না। পাশ দিয়ে কত গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার রাস্তায় এখন আন্দাজ বেলা এগারোটা। ফুটপাথে লোকের মিছিল। কিন্তু সুনন্দর চেঁচিয়ে লোক জড়ো করার কোনো উপায় নেই। পিস্তলের নলটা পাঁজরের মধ্যে যেন গেঁথে আছে, গাড়িতে ঝাঁকুনি লাগলেই ব্যথা লাগছে।

মিনিট দশ-পনেরো চলার পর গাড় চৌরঙ্গি পেরোল। চোখ বন্ধ থাকলেও অনুমান করে নিতে অসুবিধে হল না। কী কারণে যেন কলেজ স্ট্রিটের ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাম গুমটি থেকে সেটা মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল। তার মানেই ধর্মতলা কার্জন পার্কের সেই ট্রাম গুমটি বাঁ পাশে রেখে তারা সোজা উত্তরমুখে এগোচ্ছে। সামান্য বাঁক নিয়ে কিছু এগিয়েই গাড়িটা থামল। তারপর ব্যাক করে গাড়ি দাঁড়াবার জায়গায় অন্য গাড়ির মাঝখানে গিয়ে ঢুকল। নাক কান তীক্ষ্ণ করে সুনন্দ বোঝার চেষ্টা করছিল জায়গা ঠিক কোথায়।

কেউ একজন নেমে গেল গাড়ি থেকে। গাড়ি থেমে থাকলেও স্টার্ট কিন্তু বন্ধ হল না, ধিক ধিক করে ইঞ্জিন চলার কাঁপুনি টের পাওয়া যাচ্ছিল। গাড়ির ভিতরে এতগুলো লোক কিন্তু নিঃশব্দ। পিস্তলের নলটা ছাড়া এদের অস্তিত্ব টের পাবার যেন কোনো উপায় নেই। কোনো জায়গা থেকে কচুরি ভাজার গন্ধ এল নাকে। চকিতে একটা হদিস খেলে গেল মাথায়। বোধহয় চাঙোয়ার কাছাকাছি, গাঙ্গুরামের দোকানের সামনে তাদের গাড়ি পার্ক করা হয়েছে। এখানে কেন ? এখানে কিসের অপেক্ষা ?

গাড়ির জানলার খুব কাছে কেউ চাপা গলায় কথা বলল, "কুইক, অ্যাটাচি কেসগুলো নিয়ে এসো। ওরা পজিশন নিয়ে নিয়েছে।"

দুপাশে দরজা খোলার শব্দ হল। বোঝা গেল গাড়ি হালকা হচ্ছে। কিন্তু কিসের এত তাড়া, তার মাথায় ঢুকতে আরও কয়েক মিনিট সময় আর গোটা দুই শব্দের আয়োজন ছিল। পর পর দুবার বোমা ফাটার আওয়াজ হবার পরেই কারা হুড়মুড় করে ছুটে পালাল। গাড়ির যাত্রীরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িতে ফিরে এল। দরজাদুটো বন্ধ হবার আগেই গাড়ি চলতে শুরু করল। পার্কিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে গাড়ি আবার উত্তর দিকে, তার মানে শ্যামবাজারমুখো ছুটে চলল।

"সব ঠিক আছে ? প্ল্যানমাফিক ?"

"ও কে !"

"এখন তাড়াহুড়ো কোরো না। রাজা, তুমি পেছনে নজর রেখো।"

সুনন্দ বুঝল এরা এই মাত্র যা করে এল কাল সকালের কাগজে তার ব্যানার হেড-লাইন ছাপা হবে। আজ সন্ধের টিভি আর রেডিওতে খবর থাকবে। আবার দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি। তিন-চার কিংবা পাঁচ লক্ষ টাকা।

সুনন্দর পাঁজরের কাছ থেকে পিস্তলের নলটি কখন অদৃশ্য হয়েছিল খেয়াল করেনি। শুধু তার দুপাশেই মানুষ, একটু যেন ঠাসাঠাসি করে বসেছে। গাড়ির মধ্যে এখন বেশ কিছুক্ষণ আর কথা নেই। গাড়ির গতি যেন ক্রমশই একটু-একটু করে বাড়ছে। ভয়ে ভাবনায় সুনন্দ অল্প-অল্প ঘামতে শুরু করেছিল।

"রাজা !"

"তেমন কিছু চোখে পড়ছে না।"

"তাহলে এবার এই বাঁকের মুখে নাম্বার প্লেটে ফিনিশিং টাচ দাও। স্টপ।"

গাড়ির গতি কমে এসেছিল। জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ব্রেক কষল। দরজা খুলল। সুনন্দ অনুমান করল গাড়ির নম্বর বদলানো হচ্ছে। কিংবা একতাল কাদা বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে একটা বা দুটো সংখ্যা হয়তো ঢেকে দেওয়া হবে। কিন্তু যাই হোক না কেন, এদের ব্যূহ থেকে তার পালানোর আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

এবার গাড়িটা স্পিডে ছুটল। বোধহয় ফাঁকা রাস্তা পেয়েছে। শহর ছাড়িয়ে হয়তো এখন শহরতলি, কারণ পথ নির্জন হয়ে এসেছে। গায়ে গায়ে আর কোনো গাড়ি ছুটছে না। গাড়ির সংখ্যা অনেক কমে এসেছে বোঝাই যায়।

একটা নতুন গলা শোনা গেল গাড়ির মধ্যে, "গুরু, কানামাছিটাকে আর কেন ?"

"পরে হবে ! ভুলে যেও না ওর মাথার দাম এখন সাত লাখ আশি হাজার। অনেক কিছু জানবার আছে।"

সুনন্দর বুঝতে বাকি থাকল না কথাটা উঠেছে তাকে নিয়েই। বরফ-জলের কয়েকটা ফোঁটা যেন শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ। গাড়ি ছুটছে সম্ভবত আশি থেকে নব্বুই কিলোমিটার বেগে।

হঠাৎ গাড়ির মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। পেছনের সিট থেকে রাজা চাপা গলায় বলল, "ব্যাড লাক্। দে আর কামিং। ভ্যান, জিপ আর একটা প্রাইভেট কার।"

সম্ভবত চালকের আসন থেকে কেউ বলল, "প্রাইভেটটাকে আমি কলকাতায় যেন বার-কয়েক দেখতে পেয়েছিলাম।"

"আরও জোরে।"

তার পর প্রায় মিনিট পনেরো ধরে গাড়ি ছুটল উন্মাদের মতো ঝড়ের গতিতে, প্রতি মুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। কখনো আচমকা লাফিয়ে, কখনো স্কিড করে, কাত হয়ে টাল সামলাতে সামলাতে। ছাগল, কুকুর কিছু একটা চাপা পড়ল গাড়ির তলায়, মানুষও হতে পারে। এত করেও দূরত্ব বোধহয় কমে আসছে। গুলির শব্দ, বোমের আওয়াজ। একটা তাণ্ডব। একটা গুলি এসে বোধহয়, পেছনের চাকায় লাগল, টায়ার বার্স্ট করল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে ঘুরে গিয়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়ল। তারপর তিন-চারবার লাফিয়ে উঠেই হুড়মুড় করে কিছুর ওপর ভেঙে পড়ল। ব্যস, সুনন্দর ভেতরে বাইরে অন্ধকার, সে আর কিছুই জানতে পারল না।

চোখ মেলার পর, অনেক বেলা হয়েছে ভেবে ধড়মড় করে উঠে বসতেই কমলেশকাকু এগিয়ে এলেন,"ও কী ও কী, ওভাবে উঠিস না।"

সুনন্দ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাল, কিছুই বুঝতে পারল না। রাস্তার ধারে একটা জামাকাপড়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চের ওপর সে বসে আছে। চারপাশে অনেক লোক। গাছগাছালির মাথায় উজ্জ্বল রোদ, বিকেল হয়ে এসেছে। রাস্তার ওপারে অনেক পুলিশ, গোটা দুই জিপ, আর কালো রঙের ভ্যান-গাড়ি।

কী মনে পড়তেই সুনন্দ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। দুঃস্বপ্ন নয়, তার দেখা ঘটনাই, সিনেমার রুদ্ধশ্বাস ছবির মতো একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল। তাড়াতাড়ি চোখে হাত দিয়ে দেখল। যেন সেই ঢাউস ব্যাণ্ডেজটা খসে যেতেই আবার সব দেখতে পাচ্ছে।

কমলেশবাবু পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে ওর মুখের ভাবান্তর লক্ষ করছিলেন। এবার মিষ্টি হেসে বললেন, "সব মনে পড়েছে ?"

"হ্যাঁ।" অবিশ্বাসের গলায় সুনন্দ বলে, "প্রথমে ভেবেছিলাম, স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে জেগেছি।"

ঠিক সময়ে গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছিটকে না পড়লে অবিশ্যি এ জীবনে আর তাকে জাগতে হত না। যেমন জাগেনি ওই গাড়ির ড্রাইভার। লোহার শিক ভর্তি লরির ওপরে গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বেরিয়ে থাকা লোহার রডে লোকটার বুক মাথা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। একেবারে স্পট ডেড। কমলেশকাকাই সংক্ষেপে বললেন ঘটনাটা। পুলিশের গুলিতে গাড়ির চাকা ফেটে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টাই রড কেটে গিয়েছিল। গাড়িটা যখন পাগলের মতো পাশের কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়েছে সেই সময় দরজা খুলে ডাকাতরা বাইরে লাফিয়ে পড়ে লুটের টাকাকড়ি নিয়ে চম্পট দেয়।

বাকি কাজ এবং জলযোগ সেরে কাঁচড়াপাড়া বাঘের মোড় থেকে যখন কমলেশকাকা রওনা দিলেন তখন সন্ধে

ছটা। আলো মরে এসেছে। গাড়িব পেছনের সিটে নরম গদির মধ্যে আধখানা পিঠ ডুবে গেছে। কমলেশকাকু আয়েশ করে একটা চুরুট ধরালেন। সুনন্দ একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল। উনি যেন রিডিং জানেন, আচমকা সেই প্রশ্নটারই উত্তর দিলেন।

"তুই জানিস না, আমি তোর ওপরে সর্বক্ষণের পাহারা বসিয়েছিলাম। পাছে তোর কোনো বিপদ-আপদ হয়। তোকে যখন ওরা গাড়িতে তুলে হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল আমার লোকটি তখন ট্যাক্সি নিয়ে ফলো করে। এই আমার ভ্রমণকাহিনী।" থেমে একটু হাসলেন, "এবার তোর কথা বল। নতুন কোনো খবর আছে?"

সুনন্দ ঘাড় নেড়ে জানাল, আছে। তারপর সবিস্তারে পাম ভিলার ঘটনা থেকে শুরু করল। সুনন্দর কথা শেষ হলে বললেন, "হুঁ! এতক্ষণে ডাক্তারের খুনের মোটিভটা পরিষ্কার হল আমার কাছে।"

সুনন্দ উৎসাহের সঙ্গে বলল, "আমি বলব?"

"বল।"

মুখে রহস্য ফুটিয়ে সুনন্দ বলল, "সাত লাখ আশি হাজার।"

কমলেশবাবু চমকে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন, "মানে?"

"মানে টাকা। ওই পরিমাণ টাকা। যা খুঁজতে দুজন ডাকাত পাম ভিলায় আজ সকালে হানা দিয়েছিল। জানো কাকু, আমি মিছিমিছি সুনীতিবাবুকে সন্দেহ করেছিলাম। ওদের গাড়িতে যখন কানামাছি হয়ে বসো ছিলাম তখন অ্যামাউন্টটা শুনতে পেয়েছিলাম। ওরা বোধহয় ভেবেছিল আমার কাছ থেকে কিছু খবর বের করতে পারবে।"

"দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া!" কবিতার লাইন বলার মতো ছন্দ নিয়ে উনি যেন উচ্চারণ করলেন। "হুঁ, এতক্ষণে হদিস পেলাম। ডাক্তারবাবুর ডেস্ক ক্যালেণ্ডারে একটা অদ্ভুত নাম আর একটা ফোন নম্বর পাওয়া গিয়েছিল। কূপমণ্ডুক ৭৮-০০০০। নম্বরটা ফেক। এখন বুঝতে পারছি ওটা আসলে টাকার সংখ্যা। সাত লাখ আশি হাজার। কিন্তু কূপমণ্ডুক কার ছদ্মনাম বুঝতে পারছি না।"

"কূপমণ্ডুক মানে তো কুয়োর ব্যাঙ।" সুনন্দ বলল, "ওরকম আবার কারো নাম হয় নাকি! ধ্যাত্। কিন্তু অত টাকা ডাক্তারবাবু পেলেন কোথায়? তুমিই তো বলেছিলে ওঁর প্র্যাকটিস ভাল ছিল না। ব্যাঙ্কে মাত্র—"

"আহা এটা তো সরল ব্যাপার। ব্যাঙ্কডাকাতদের উনি ছিলেন ক্যাশিয়ার। ফাণ্ড আগলাতেন। কে জানে উনিই ওদের ব্রেন ছিলেন কিনা। নাকি নিরুপায় হয়ে জড়িয়ে গিয়েছিলেন ওদের সঙ্গে। ডাকাতির টাকা এমন এক জায়গায় কিছুকাল লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়, যা পুলিশের কল্পনার বাইরে থাকবে। ডাক্তার ঘোষরায় সেইরকম একজন মানুষ ছিলেন।"

"তা সত্যি। ব্যাপারটা হজম করতে সুনন্দর রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই ওই টাকাটা ফাঁকি দিতে চেয়েছিলেন। তাই খুন হয়ে গেলেন।"

সুনন্দ আপসোসের গলায় বলল, "ইশ্, খুনিরা শেষ পর্যন্ত আমাদের হাত ফশকে পালাল।"

কমলেশকাকা মাথা নাড়লেন, "না, এখনো পালাতে পারেনি বোধহয়, এতক্ষণে ধরাও পড়ে গেছে। আমি অয়্যারলেসে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। আসলে খুনের সমাধান আমি আগেই করে ফেলেছিলাম, কিন্তু খুনের উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছিলাম না বলে অপেক্ষা করে ছিলাম। আর জানিস তো, এর জন্যে সবচেয়ে বড় ক্রেডিট কার?"

অবাকের ওপর অবাক। সুনন্দ কোনো

প্রশ্ন করতে পারল না, শুধু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল। "তোর।" কমলেশকাকা আদর করে সুনন্দর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, "প্রথম ভাইটাল জটটা তুই ছাড়িয়ে দিয়েছিস। ইনফ্যাক্ট তুই আমার চোখ খুলে দিয়েছিলি।" চুরুট নিবে গিয়েছিল, কমলেশকাকা আবার সেটা ধরিয়ে নিলেন। "গল্পটা এই রকম। ডাক্তার ঘোষরায় হঠাৎ খুন হয়ে যাওয়ায় ডাকাতের দল একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের তবিলদার এভাবে উইদাউট নোটিস হাওয়া হয়ে যাবে ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। ব্যাপারটা যে পলিটিক্যাল মার্ডার তা বুঝতে পেরে ওরা দিন কয়েক গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারপর যখন বুঝল পুলিশের নজর ওবাড়ি থেকে সরে গেছে, তখন টাকাটার সন্ধানে হানা দিয়েছিল। কিন্তু অনেক তল্লাশি করেও সে টাকা উদ্ধার করতে পারেনি।"

"আসল খুনি সে টাকা আগেই সরিয়ে দিয়েছে বলছ ?"

"উহুঁ। আমার কিন্তু মনে হয় টাকাটা ও বাড়িতেই কোথাও লুকনো আছে। এখনো তাতে হাত পড়েনি।"

"কিন্তু খুনি কারা তাই তো আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"যথাসময়েই জানতে পারবি কিন্তু তার আগে কয়েকটা তথ্য তোর জানা দরকার। খুনের আগে যে চা হয়েছিল দু'কাপ সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। কিন্তু সেই চায়ের কাপ দুটো কিন্তু পাওয়া যায়নি। কেউ ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে তুলে রেখেছিল সম্ভবত। দু নম্বর, আমেরিকান সেন্টারে সুনীতি সেদিন কিন্তু সিনেমা দেখতে যায়নি। কারণ নিমন্ত্রণপত্রের খামটি ওখানে জমা নিয়ে নেয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি সুনীতির নামের নিমন্ত্রণপত্রের কোনো খাম ওখানে জমা পড়েনি। তাহলে শুধু-শুধুই কি ওই মিথ্যে কথাটা ও আমাদের বলেছিল ? তিন, সুনীতির অবস্থা ইদানীং খুব ভাল যাচ্ছিল না। খবর নিয়ে জানা গেছে বাজারে ওর অনেক দেনা। বাজারে যার এরকম দেনা, সে কেন আলমারিতে হাজার-দেড়েক টাকা পেয়েও সরাল না ? নিজেই যেচে খবরটা আমাদের দেওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল !"

"কী কারণ, তুমিই বলো।"

"নিজেকে সন্দেহের বাইরে রাখা। ও নিশ্চয়ই ঘটনাচক্রে ওই মোটা টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। টাকাটা কোথায় আছে সেটা সুনীতি নিশ্চয় করে জানে। জানে বলেই চুপচাপ করে আছে। শ্রাদ্ধটাদ্ধ মিটে গেলে, বাড়ি খালি হয়ে সব যখন থিতিয়ে যাবে তখন সে টাকা হাতিয়ে নিয়ে সে ও বাড়ি থেকে চম্পট দেবে ভেবে রেখেছে।"

"খুনটা তাহলে ওরই কীর্তি ?"

"সূত্রগুলো সব জুড়লে তো তাই দাঁড়ায়। দাঁড়ায় না কি ?"

সুনন্দ আর কথা বলল না, চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। গাড়ি ছুটে চলেছে, বাইরে অন্ধকার। মাঝে মাঝে রাস্তাটা গঙ্গার খুব কাছে এসে পড়ছে। স্ট্রিট লাইট ছাড়িয়ে থেকে থেকে নদীর বুকে লঞ্চ কিংবা নৌকোর আলো চোখে পড়ছে।

হঠাৎ সুনন্দ ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসল। তার পর কমলেশকাকার একটা হাত চেপে ধরে বলল, "পেয়েছি।"

"কী পেয়েছিস ?"

"কূপমণ্ডুক কথাটার আসল মানে। ও বাড়ির বাগানের মধ্যে একটা কুয়ো আছে দেখেছ ?"

কমলেশবাবু ঘাড় নেড়ে বোঝালেন তিনি দেখেছেন।

"টাকাটা ওই কুয়োর মধ্যেই আছে। আমি সেদিন সুনীতিবাবুর ঘরে নতুন কিনে আনা কুয়োর কাঁটা দেখেছি, মনে পড়ে গেল।"

কমলেশকাকা অবাক মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

ধাঁধা

ঘরে ঢুকতেই ছোট্‌কা বলল, "আচ্ছা, সেই রঙমশালের ধাঁধাটা কোথায় গেল ? ওটা বলিনি তোমায় সতুবাবু ?"

তক্ষুনি আমার মনে পড়ে গেল পুরো ঘটনাটা। তাই তো, দারুণ ভুলে গেছি ব্যাপারটা। ভাগ্যিস, ছোট্‌কা ভোলেনি।

ঘটনাটা কালীপুজোর সময়কার। রঙমশালের সবটা যে জ্বলে না, এ আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। তা, এবার রঙমশাল জ্বালাতে গিয়ে হঠাৎই ছোট্‌কা আমায় বলেছিল, "এই রঙমশাল নিয়ে একটা ছোট্ট ধাঁধা দিচ্ছি সতুবাবু। উত্তর করো তো ?"

ছোট্‌কা ধাঁধাটা বলেছিল। উত্তর একটা আমি বলেছিলাম বটে অনেক ভেবেচিন্তে, কিন্তু তাতে যে একটু ভুল ছিল, ছোট্‌কা তক্ষুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। আর সেটা শুনে আমি লজ্জায় জিভ কেটেছিলাম। কী অদ্ভুত ভুল করেছি আমি। ধাঁধাটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং।

কালীপুজোর পরে এতগুলো দিন চলে গেছে। ওটার কথা কীভাবে যেন বেমালুম ভুলে গেছি। আজ মনে পড়ল। তাই ওটা দিয়েই শুরু করছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ একজন লোক নিজেই রঙমশাল তৈরি করে। সে দেখল, তৈরিতে কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে। বালি পর্যন্ত জ্বলার আগেই রঙমশালগুলো নিবে যাচ্ছে। বেশ কিছুটা করে বারুদ প্রতি রঙমশালেই থেকে যাচ্ছে, না-জ্বলা অবস্থায়।

লোকটা এ নিয়ে মাথা ঘামাল নানাভাবে। অবশেষে, সে একটা উপায় বার করল। সে দেখল, তিনটে করে পোড়া রঙমশালের বাড়তি বারুদ নিয়ে নতুন একটা রঙমশাল যদি তৈরি করা যায়, সে-রঙমশালটাও অন্যগুলোর মতনই কিছুটা বাদ রেখে জ্বলে। আবার তার অবশিষ্ট বারুদও পরে কাজে লাগে একইভাবে।

এই তথ্য মনে রেখে এবার আসল ধাঁধা। ধরা যাক, লোকটা প্রথমে ২৯টা রঙমশাল তৈরি করেছে। এই ২৯টাই সে জ্বালাবে। আবার এগুলোর অবশিষ্ট বারুদ দিয়ে নতুন রঙমশাল তৈরি করবে। সেগুলো জ্বালাবে। সেগুলোর অবশিষ্ট বারুদ দিয়ে ফের তৈরি করবে, ফের জ্বালাবে।

তা, ২৯টা নতুন রঙমশাল যদি প্রথমে তৈরি করে লোকটা, এইভাবে বানিয়ে বানিয়ে আর জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সে শেষ পর্যন্ত কটা রঙমশাল জ্বালাবে মোট ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একজন বলল, "আমার কাছে যত কুকুরছানা রয়েছে তার চার ভাগের তিন ভাগ আর একটা কুকুরছানার চার ভাগের তিন ভাগ যোগ করলে সেই মোট সংখ্যাটা জানা যাবে।" এই হেঁয়ালি-ভরা কথা থেকে বার করতে হবে, তার মোট কটা কুকুরছানা রয়েছে।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

হি ম ব ন ভু নী মো নো

গতবারের উত্তর ॥ (১) মৌ ৮, মিষ্টু ৫, টুপটুপ ১২, তুলতুলি ২০— এভাবেই মোট ৪৫টা ঝিনুক ভাগ হয়েছিল। (২) সাহ (স) সাগরা। (৩) কপালকুণ্ডলা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

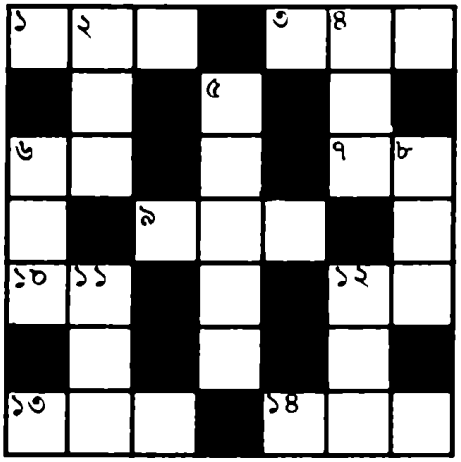

সংকেত : পাশাপাশি : (১) প্রশংসাসূচক অব্যয়। (৩) আচারবিশেষ। (৬) সংক্ষেপে অতীতের এক ভারতীয় ফুটবল-কোচ। (৭) গাছ। (৯) হঠাৎ— ওলটালে ভিন্নার্থক শব্দ। (১০) কোন্ জিনিস হারালে বিপদ ঘটতে পারে ? (১২) হত্যাকাণ্ড। (১৩) শিব। (১৪) অন্য রকমের বেল।

উপর-নীচ : (২) চিনি বা গুড়ের তৈরি মিঠাই। (৪) জনৈক প্রাচীন চিকিৎসক। (৫) দৃষ্টান্ত। (৬) বাগান। (৮) শূন্যস্থান পূরণ করো : নতুন ক্লাসে নতুন বই, কিন্তু নতুন — কই ? (১১) দেরি। (১২) মাটি খোঁড়ার অস্ত্র।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

চা	চা	■	মে	■	পা	না
■	ম	হি	সো	পা	ন	■
■	চি	■	প	■	কৌ	■
টি	কা	■	টে	■	টি	পু
ম	■	কি	মি	তি	■	ণ্ড
টি	প	■	য়া	■	ক	রী
ম	ট	র	■	কী	চ	ক

মজার খেলা

সাদা কাগজ কেটে চৌকো আটটা টুকরো প্রথমে করে নাও। তারপর নীচের ছবিতে যেমন-যেমন দেখানো আছে, তেমন-তেমন ভাবে একেকটা টুকরোর ওপর ইংরেজিতে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ এবং ৯ সংখ্যা লেখো। লিখে টেবিলের ওপর সাজাও, নীচের ছবিরই মতন—

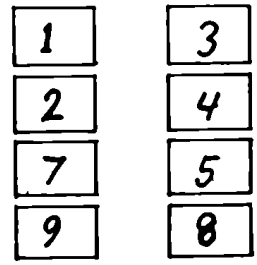

টেবিলের ওপর টুকরোগুলোকে সাজিয়েছ ? এবার কোনো বন্ধুকে ডাকো। তাকে বলো, বাঁ দিকের টুকরোগুলোর যোগফল হচ্ছে ১৯, ডান দিকের যোগফল ২০। বন্ধুকে করতে হবে কী, দু-পাশের দুটো টুকরো তুলে নিয়ে এমনভাবে জায়গা বদল করে বসাতে হবে যে, দু' দিকেরই যোগফল হবে সমান সমান।

দেখবে, বিস্তর মাথা ঘামিয়েও বন্ধু পারছে না। পারবে কী করে, একটা ছোট্ট চালাকি রয়েছে যে ! তুমি সেই চালাকিটা করে সমাধানটা দেখিয়ে দাও। নীচের ছবিটা মন দিয়ে দ্যাখো—

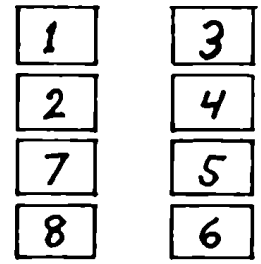

দ্যাখো, বাঁ দিকের ৯ আর ডান দিকের ৮— এই টুকরোদুটো জায়গা বদল করছে, আর ৯টাকে যখন বাঁ দিক থেকে এনে ডান দিকে বসাচ্ছ, তখন সেটা উল্টো করে বসাচ্ছ, ফলে ৯ হয়ে যাচ্ছে ৬, আর তাতেই দু' দিকের যোগফল হচ্ছে সমান সমান বা ১৮। মজাটা বুঝলে তো ?

মজারু

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ক্যাপসুলের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্র ঃ পায়জামা পরলে গায়ে কী পরলে মানায় ?

উ ঃ নিশ্চয়ই গায়জামা ।

প্র ঃ গোদের উপর কী লাগাতে হয় ?

উ ঃ বিষফোঁড়া ।

প্র ঃ এত বড় মেয়ে হয়েছ, এখনো উলটা বুনতে শেখোনি ?

উ ঃ উলটা বুনতে শিখেছি তো, সোজাটাই ঠিক হচ্ছে না এখনো ।

প্র ঃ যারা পুরি খেতে ভালবাসে তাদের কী বলে ?

উ ঃ ভোজপুরি ।

সুসেন

হাসিখুশি

ঘড়িচুরির কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায়, বিচারক আসামিকে বেকসুর খালাস দিলেন । ছাড়া পেয়েই আসামি জিজ্ঞেস করল, "হুজুর, এবার ঘড়িটা ব্যবহার করতে পারি তো ?"

ভাড়াটে নতুন বাড়িতে আসার কিছুদিন পরে এক বর্ষার রাত্রে আবিষ্কার করলেন, ছাদ থেকে জল পড়ে থৈ-থৈ । বাড়িঅলাকে একথা জানাতেই তিনি একগাল হেসে বললেন, "স্যার, বাড়ি ভাড়া দেবার আগে কি আমি বলিনি, প্রতি ঘরে যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা আছে ?"

"বিল্টু, রেডিওটা বন্ধ করে দাও তো । ভদ্রমহিলা বিশ্রী শব্দ করে চেঁচিয়ে চলেছেন ।"

"না বাবা, রেডিও চলছে না । মা তোমাকে বাজারে যেতে বলছে ।"

"বাইরে বৃষ্টি পড়ছে নাকি ?"

"বৃষ্টি তো বাইরেই পড়ে । কখনও কি দেখেছ, বাড়ির ভিতরে বৃষ্টি পড়তে ?"

"সকালে আর রাত্রিতে দুটো করে আয়রন ট্যাবলেট খাবেন ।"

"কিন্তু আমার একটাও দাঁত নেই যে ডাক্তারবাবু ।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

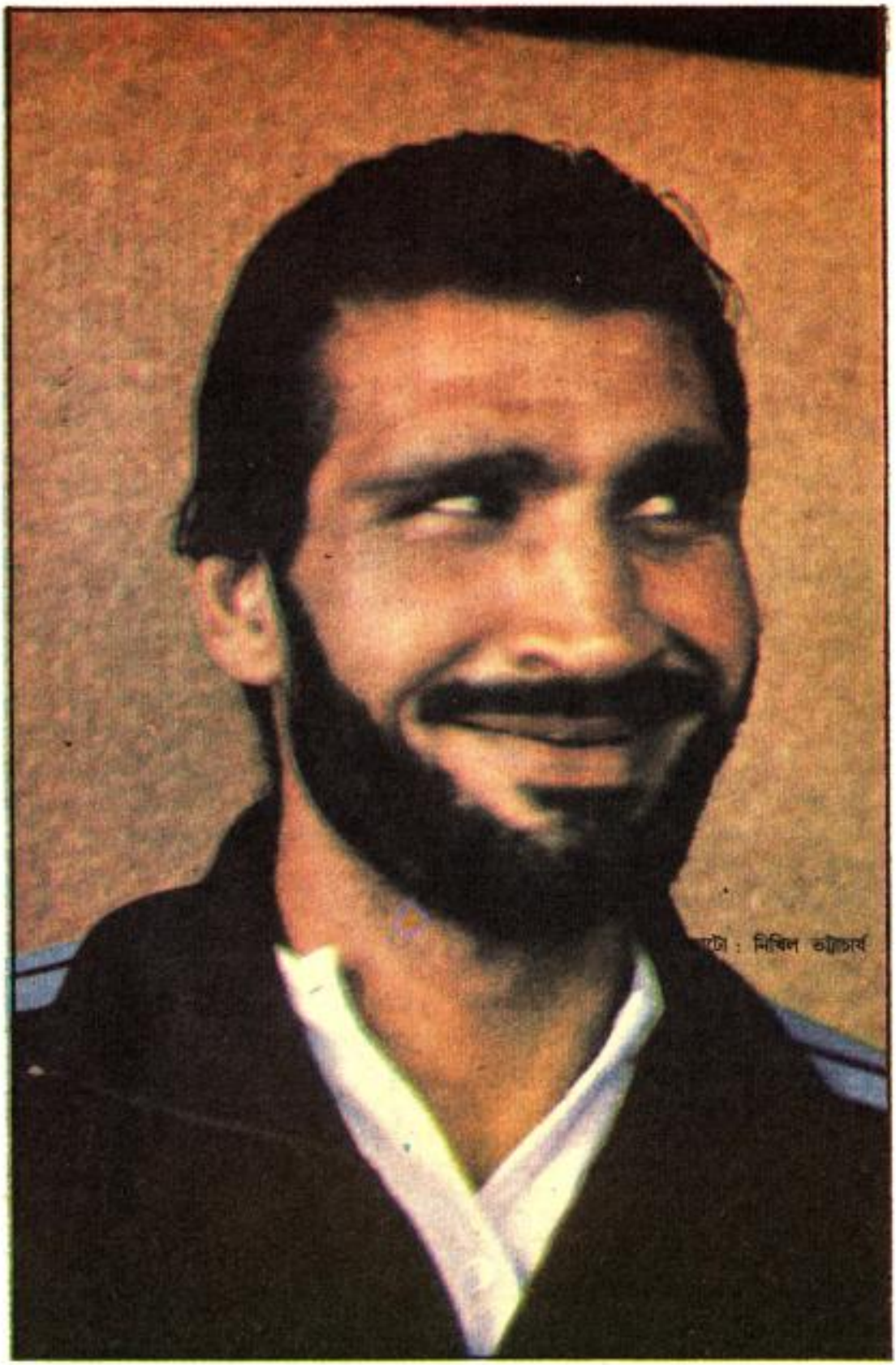

হেভিওয়েট বক্সিংয়ে স্বর্ণজয়ী **কওর সিং** (পাতা ওলটালেই খেলার খবর)

এশিয়ান বক্সিংয়ে সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের কওর সিং দিল্লিতে আবার বুঝিয়ে দিল, এশিয়ার সেরা হেভিওয়েট ও। বোম্বাই ও সিওলের এশীয় বক্সিং এবং ব্যাংকক কিংস কাপের পর মাত্র তিন বছরে কওরের এই চতুর্থ সোনা ভারতীয় বক্সিংয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

দিল্লি গেমসে সোনা দৌড় থেকে কওরকে, হঠাতে সবার আগে রুখে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানের আবদুস সালাম। সিওলে ব্রোঞ্জ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে রিংয়ে নামে সালাম। ওর দুহাতে পাথরভাঙা জ্যাব। কিন্তু আক্রমণের সুযোগই দেয়নি কওর ওকে। তূণ থেকে অস্ত্র-বার করার আগেই সালামের দুর্গ তছনছ করে দেয় কওরের লম্বা হাতের পিস্টন ঘুসি। সালামের পতনের পর রুখে আসে দঃকোরিয়ার সো বায়ে ওয়ান। ওয়ান বনাম কওর হালফিল আন্তর্জাতিক রিংয়ে এক চিত্তাকর্ষক লড়াই। ব্যাংককে ও সিওলে দু'বারই জিতেছে কওর। ওয়ান পেয়েছে বীরের সম্মান। এশিয়ার সেরা বক্সিং ঘরানার মর্যাদা রাখতে এবারও ফুঁসে উঠেছিল ও। আস্থাভরা পাদুটো সুন্দর সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেছে ওয়ানের লেফ্‌ট-রাইট পাঞ্চকে শক্তি যোগাতে বারবার। কওরের দু'পায়ে যেন জাদু। পলক পড়ার আগেই পায়ের ছন্দে ঢেউ তুলে বোকা বানিয়েছে ওয়ানকে। বিদ্যুৎ-গতিতে সরে গিয়ে ডাক করে ব্যর্থ করেছে তার ঘুসিগুলো। আবার আপারকাট হুক আর নিখুঁত ওয়ান-টু পাঞ্চে নিংড়ে নিয়েছে কওর।

ইরাকের ইস্‌মাইল এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফাইনালে। সেয়ানে সেয়ানে এই লড়াই জিততে কওরের বীজমন্ত্র, ঘুসির রাজা আলির সেই কথাক'টি—দেশের মাটিতে পদকের মূল্য অনেকগুণ বেশি। প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগেই বত্রিশ বছরের জওয়ান হাবিলদার কওর সিং বলেছিল—সোনা আনব, নিশ্চয়ই আনব।

ফৌজি বক্সাররা এনেছে আরও পাঁচটি মূল্যবান পদক। দুটো রুপো, তিনটে ব্রোঞ্জ। দুই কোরীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে সোনা ছিনিয়ে আনতে আপ্রাণ লড়েছে গ্রিড়ওয়ার সিং এবং রাজেন্দর পুনাড়ে। পারেনি। প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘুসির বিষ হজম করে লড়াই জেতার শারীরিক ক্ষমতাই কোরীয় বক্সিংয়ের সম্পদ। দঃ কোরিয়া তাই জিতেছে সাতটি সোনা, উঃ কোরিয়া তিনটে। কোরীয় ঘুসির ছোবলে ভারতের দুই অতন্দ্র প্রহরী ঢলে পড়ে সেমিফাইনালে—যশলাল প্রধান, মাচাইয়া। তৃতীয় ব্রোঞ্জটির গৌরব মালুক সিংয়ের। মন্দভাগ্য মালুকের। জয় যখন সুনিশ্চিত তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায় লেগে ভুরু কেটে গেলে রেফারি থামিয়ে দেন মালুককে।

লড়াইসূচী এমন ছিল, যাতে আমাদের বক্সাররা সেরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করেছে প্রথম ধাপেই। দুই কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তাইল্যাণ্ডের বিশ্বস্বীকৃত বক্সারদের বিরুদ্ধে তারা এমন মর্যাদার লড়াই লড়বে, ভাবেনি অনেকেই। বিশ্ব-বক্সিংয়ে রুপোজয়ী 'মঙ্গোলীয় ভয়ঙ্কর' ওটগোনবেয়ারের বিরুদ্ধে তরুণ প্রতিভা জেভিয়ারের জয় ভারতীয় বক্সিংয়ে সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। ওটগোনবেয়ারের আগুনে গোলায় দু'বার ধরাশায়ী জেভিয়ার 'ভয় কারে কয় জানিনে' ঢঙে লড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে নিজেকে। পরদিনের লড়াইয়ে সে আর তাই গর্জে উঠতে পারেনি।

ট্র্যাকের রাজা এবং রানি

অশোক রায়

এশিয়ান গেমসের অনেক ইভেন্টেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ করা গেছে। কোরিয়া-চিনের রুদ্ধশ্বাস বাস্কেটবল ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে চিনের পরাজিত হওয়া কিংবা ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম সুই কিংয়ের বিরুদ্ধে প্রথম গেমে ০-১০ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েও চিনের হ্যান জিয়ানের দারুণ লড়াই করে ম্যাচ জেতার মধ্যে দর্শকরা উত্তেজনার খোরাক পেয়েছেন। কিন্তু তবু যদি বেছে নিতে হয় তাহলে সকলেই বোধহয় একমত হবেন যে, একশো মিটার স্প্রিন্টই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, সবচেয়ে উত্তেজনাময় ইভেন্ট। তাছাড়া শত মিটার দৌড়ে জয়লাভ করলেই এশিয়ার দ্রুততম দৌড়বীরের সম্মানজনক আখ্যাটি অর্জন করা যায়। 'এশিয়ার দ্রুত-তম রানার' এই আখ্যাটি এবার পেলেন মালয়েশিয়ার রাবুয়ান পিট এবং মহিলাদের বিভাগে ফিলিপিনের লিডিয়া ডি ভেগা।

রাবুয়ান পিট (মালয়েশিয়া)

লিডিয়া ডি ভেগা (ফিলিপিন)

স্টার্টারের পিস্তল গর্জে ওঠার সময় থেকেই কোরিয়ার হাই কুয়েন হ্যাং (২০০ মিটারে সোনা জয়ী) প্রায় ছায়ার মতো এঁটে ছিলেন রাবুয়ান পিটের সঙ্গে। ঘাড়ের ওপর নিশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতেই রাবুয়ান বুকে ফিতে ছিঁড়েছেন ১০·৬৮ সেকেণ্ডে। হ্যাংয়ের চেয়ে মাত্র ০.০৪ সেকেণ্ড আগে। সোনা জেতার পরে ডিফেন্স কলোনিতে এক চাইনিজ রেস্টুরেন্টে মালয়েশিয়ার একজন অ্যাথলিট আনন্দে বলেই ফেললেন, "আমরা এশিয়াডে বেশি মেডেল পাব না ঠিকই, তবে প্রতিযোগিতার সেরা মেডেলটা তুললাম আমরাই।"

মেয়েদের একশো মিটারে ১১·৭ সেকেণ্ডে দৌড়বার ক্ষমতা ছিল নয়-নয় করেও চারজনের। ভারতের পি টি উষা তাঁদের মধ্যে একজন। সত্যিকথা বলতে কি, পিস্তলের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যখন আটটি মেয়ে ব্লক থেকে ছিটকে উঠলেন তখন আমাদের অধিকাংশেরই চোখ ছিল উষার দিকে। ফিলিপিনের লিডিয়া ডি ভেগা ভাল স্টার্ট পাননি। কোরিয়ার মেয়ুং হি এবং চিনের ফাংগুয়া জিয়ার ঠিক পেছন থেকে লিডিয়া দৌড় শুরু করলেন। তবে দু পায়ে গতির ঝড় তুলে চমৎকার নৈপুণ্যে লিডিয়াই সবার আগে পৌঁছলেন সমাপ্তি-রেখায় ১১·৭৬ সেকেণ্ডে।

মহিন্দর ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য **সেঞ্চুরি, নাকি মুখের মতো জবাব ?**

জবাব দিলেন মহিন্দর

মণীশ মৌলিক

মুখের মতো জবাব দিলেন বটে মহিন্দর অমরনাথ। গত ইংল্যান্ড সফরের সময় তাঁকে দলে নেওয়া হয়নি। কেন, সেটা অন্য কথা। কিন্তু গত সফরে তাঁকে দলে অন্তর্ভুক্ত না করাটা যে ভুল হয়েছে, তা লাহোরে চোখে ব্যাট দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তিনি। পাকিস্তানে যাওয়ার আগে কলকাতায় এসেছিলেন সুনীল গাভাসকর। মহিন্দরের সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে বলেছিলেন, আমার ধারণা, মহিন্দর দুর্দান্ত ফর্মে আছেন। বোলিংয়ে তিনি হয়তো আগের মতো নেই, কিন্তু ব্যাট করছেন দারুণ। পাকিস্তান সফরে তিনি বেশ ভাল রান পাবেন বলে মনে হচ্ছে। খুব সিরিয়াস খেলোয়াড়! আর কী কনসেনট্রেশান!

সন্দীপ পাটিল

জাহির আব্বাস

তিনি বোধহয় ব্যাটিং নিয়ে এখন আমার চেয়েও বেশি ভাবেন।

সানি ঠিকই বলেছেন। মহিন্দরের বোলিংয়ের জোর কমে গেছে। তবে, হাতে সুইংয়ের কাজ এখনও সেরকমই আছে। অনেক উন্নতি হয়েছে ব্যাটিংয়ের। আলগা বল পড়লেই আর রেহাই নেই। তেমনি ভাল বলকে আরও ভালভাবে খেলছেন। যখন-তখন অনের দিকে লাফিয়ে ওঠা বলকে হুক করতে যাচ্ছেন না। দায়িত্ব এবং ধৈর্যের সঙ্গে খেলে, লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে নিজের তৃতীয় সেঞ্চুরিটি করে মহিন্দর প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ভারতীয় দল তাঁর ওপরে আস্থা রাখলে ভুল করবে না। আমরাও তো তাই চাই। মহিন্দর আরও ভাল খেলুন। ইমরান গর্ব করে কলকাতায় যা বলে গিয়েছেন, তা ভুল প্রমাণ করার জন্যে মহিন্দরকে আরও ভাল ব্যাট করতে হবে।

প্রথম টেস্টে একটুর জন্য ফসকে গেল সানির পঁচিশতম সেঞ্চুরিটি। আশির ঘর

পেরিয়ে গেলেও কি সানির সেঞ্চুরি নিয়ে ভাবতে হয় ? কিন্তু দশাসই চেহারার সরফরাজের একটা চমৎকার বল সানিকে চমকে দেয়। নইলে এই সেঞ্চুরিটা ফসকে যেত না। সানি মানেই রেকর্ড। ইডেনে আসিফ ইকবাল বলেছিলেন : সানির সম্বন্ধে কী বলব ? ব্যাট ধরলেই যে রেকর্ড করে, তার সম্পর্কে কিছু বলার দরকার হয় ?

সেই সানি লাহোর টেস্টে নিজের সাত হাজার রান পূর্ণ করলেন। এখন তাঁর রানসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,০৩৪। টেস্টে ব্যক্তিগত রান সংগ্রহের খাতায় সানির চেয়ে আগে রয়েছেন মাত্র চারজন—বয়কট, সোবার্স, হ্যামণ্ড এবং কাউড্রে। এতেই শেষ নয়, আরও আছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাজার রান করার গৌরবও অর্জন করেছেন আমাদের গাভাসকর। জানো নিশ্চয়ই, অস্ট্রেলিয়ার গ্রেগ চ্যাপেল ছাড়া এমন কৃতিত্ব আর কারও নেই। শাবাশ সানি।

বাহবা দিতে হয় জাহির আব্বাসকেও। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে একশোটা সেঞ্চুরি করা কি চাট্টিখানি কথা ! লাহোরে হৈ-হৈ ডাবল সেঞ্চুরি করার সুবাদে জাহির সেই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হলেন। মনে পড়ে, এই লাহোরেই চার বছর আগে জাহির একটা ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। সেবার করেছিলেন ২৩৫, এবার করলেন ২১৫। ভারতের পেস এবং স্পিন বোলিংকে একটুও সমীহ না করে জাহির যেভাবে খেলেছেন, তা অনেকদিন মনে থাকবে। ড্রাইভ, কাট, পুল, হুক, কী করেননি তিনি ? দুশো দিয়ে সিরিজ শুরু করেছেন জাহির। টেস্টে ন'টা সেঞ্চুরির মধ্যে চারটে ডাবল। সত্যি কথা বলতে কি, জাহিরকে নিয়ে আমাদের একটু ভয়ই হচ্ছে। আমাদের এক ছোট্ট বন্ধু জাহিরের খেলা দেখে মুগ্ধ। আবার চিন্তিতও। ব্রাডম্যানের দশটা ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে দেবার তালে আছেন না কি জাহির ?

দারুণ খেলেছেন মহসিনও। দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার ফলে মহসিনের শতরানের সংখ্যা দাঁড়াল তিন। প্রশংসনীয় ব্যাটিং করেও মহসিন প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি পাননি মাত্র ছ' রানের জন্য। দুর্ভাগ্য বলতে হবে। নইলে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরিকারীদের তালিকায় তাঁর নাম সংযোজিত হত। যাই হোক, মহসিনকে নিয়েও ভাবনার অন্ত নেই। মাত্র নটি টেস্ট খেলে এক ক্যালেণ্ডার-ইয়ারে হাজার রান করার কৃতিত্ব যাঁর পকেটে ঢুকেছে, তাঁকে নিয়ে ভাবনা হয় বৈ-কি। দুটি চমৎকার ইনিংস খেলেছেন মহসিন। হৈ-চৈ নেই, হুড়োহুড়ি নেই, লাহোরে ঠাণ্ডা মাথায় যথার্থ ওপেনারের ভূমিকা পালন করেছেন মহসিন হাসান খাঁ।

ধুন্ধুমার বাধিয়েছিলেন সন্দীপ পাটিল। ইমরান, সরফরাজ, নাক্কাশ বা জালালুদ্দিন, কেউ দীপ্ত সন্দীপকে দমিয়ে রাখতে পারেননি। মাঠ মাতানো, সাহসী ব্যাটিং করে তিনি দেখিয়ে দেন পাকিস্তানি বোলিংকে ভয় পাবার তেমন কোনো কারণ কিছু নেই। ৬৮ রানের মধ্যে ছিল এগারোটা চার আর একটা ছয়। অর্থাৎ ৫০ রান এসেছে বাউণ্ডারির বাইরে থেকে। মারের বহরটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ৫৯টি বল খেলে ৬৮টি রান। সত্যি কথাটা এই, পাটিল ইমরানকে ঘাবড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়, শেষ পর্যন্ত পাটিল রান আউট হয়ে গেলেন। তাঁর আউট হওয়া সম্পর্কে অবশ্য অনেকেরই সন্দেহ আছে। মেহবুব শাহের আঙুল তোলা আমাদের বিস্মিত করেছে। আর পাটিলকে বঞ্চিত করেছে তাঁর আরও একটা সেঞ্চুরি থেকে।

করাচিতে ব্যাটে-বলে লড়াইটা বেশ জমবে বলেই মনে হচ্ছে। বোলিংয়ে তেমন না হলেও, ভারত পাকিস্তানের চেয়ে ব্যাটিংয়ে কম শক্তিশালী নয়। বোলিংয়ে জোর বাড়াবার জন্য রবি শাস্ত্রীর জায়গায় মনিন্দর সিংকে নিলে কেমন হয় ?

ক্যাঙারুর কোলে হাতি

স্ট্রাইকার

মেলবোর্নের এসানডা হকি টুর্নামেন্টের ফাইনালে সারাটা ম্যাচ ক্যাঙারুর কোলে হাতি যেন ভয়ে চুপটি করে বসে ছিল। বলা যায়, হাতিকে ক্যাঙারু দাবড়ে নিজের কোলের থলেতে পুরে রেখেছে। ক্যাঙারু অস্ট্রেলিয়ার পয়মন্ত প্রতীক, হাতি ভারতের। দু-দেশের খেলা থাকলে ভক্তদের খর নজর থাকে, কে কাকে দমিয়ে রাখে তাই দেখার। এসানডা ফাইনালে ভারত ১—৬ গোলে হারে। সকলেই থ, টুর্নামেন্টভর এত দুঁদে খেলা খেলেও হাতি কেন ক্যাঙারুর কাছে চুপসে গেল!

ওই ফাইনালে ট্রানজিস্টরের সামনে কান পেতেছিলাম ভারতের হকি নির্বাচক গুরুবক্স সিংয়ের সামনে। একটু দেরি হয়েছিল, ওঁর বাড়ি যেতে। ভারত দু' গোল খেয়েছে—এই দুঃসংবাদ দিতে দিতে গুরুবক্স দরজা খুললেন। রবিবার ছুটির মেজাজ। গুরুবক্সের তখনও গোঁফদাড়িতে মাঞ্জা দেওয়া শেষ হয়নি। হুটপাট করে ব্যাপারটা চুকিয়েই ওঁকে সারা ফ্ল্যাট ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। অস্ট্রেলিয়া হা-রে-রে-রে করে বারবার তখন ভারতের গোলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। হাফ-টাইম হতে না-হতেই ভারত এক গণ্ডা গোল হজম করল। দেখছি গুরুবক্স তুকতাকে ভুগছেন। ট্রানজিস্টর ঘর থেকে টেনে বারান্দার টেবিলে রাখলেন, চেয়ার পালটে অন্য একটা চেয়ারে বসলেন, চশমা খুলে টেবিলের নীচে রাখলেন, উৎকণ্ঠায় সারা কপালের শিরা ঢোঁড়াসাপের মতো ফুলে উঠল, দাঁতে দাঁত কামড়ালেন, মায়ের দিকে ব্যাজার মুখে তাকিয়ে কী যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু না; ভারত হারল সেই আধ ডজন গোলেই।

খেলা-শেষে কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে গুরুবক্স ধরা-গলায় বললেন, "সারা টুর্নামেন্ট এমন টগবগিয়ে খেলে শেষে ভারত এমন ভেঙে পড়বে ভাবিনি। হক কথা, সিনথেটিক কার্পেটের হকিতে আমাদের ছেলেরা এখনও পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারল না। পিঠোপিঠি দিনে সেমিফাইনাল আর ফাইনাল খেলেছে ভারত। দু' দিনই জবরদস্ত টিম নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া। ধকল ভারতের ছেলেরা সামলাতে পারেনি। দুটো খেলার মধ্যে অন্তত একদিনের তফাত থাকলে, এ রেজাল্ট হত না। আশার কথা, এশিয়াডে পাকিস্তানের হারের বদলা ভারত ওখানে নিয়েছে। এসানডার ফল ধরলে, সদ্য সদ্য ভারত এখন এশিয়াতে সেরা, বিশ্বে দ্বিতীয় সেরা হকি শক্তি। আরও সময় যাক, ভারতের এই তরুণদল রেওয়াজে পোক্ত হয়ে আলবাত চাম্পিয়ন টিম হবেই।"

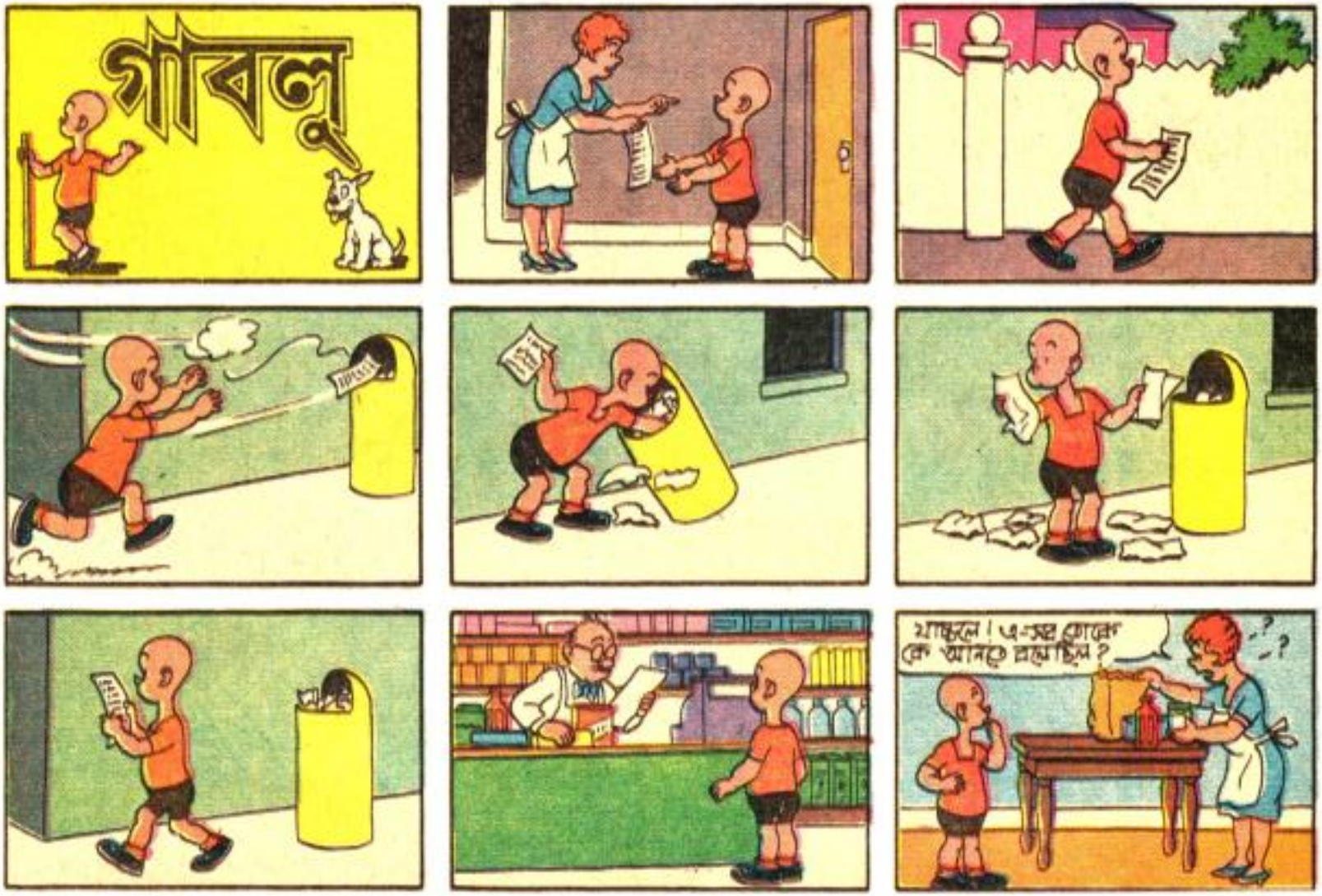

গাবলু
যাচ্চলে ! এ-সব কোত্থেকে
কে আনতে বলেছিল ?

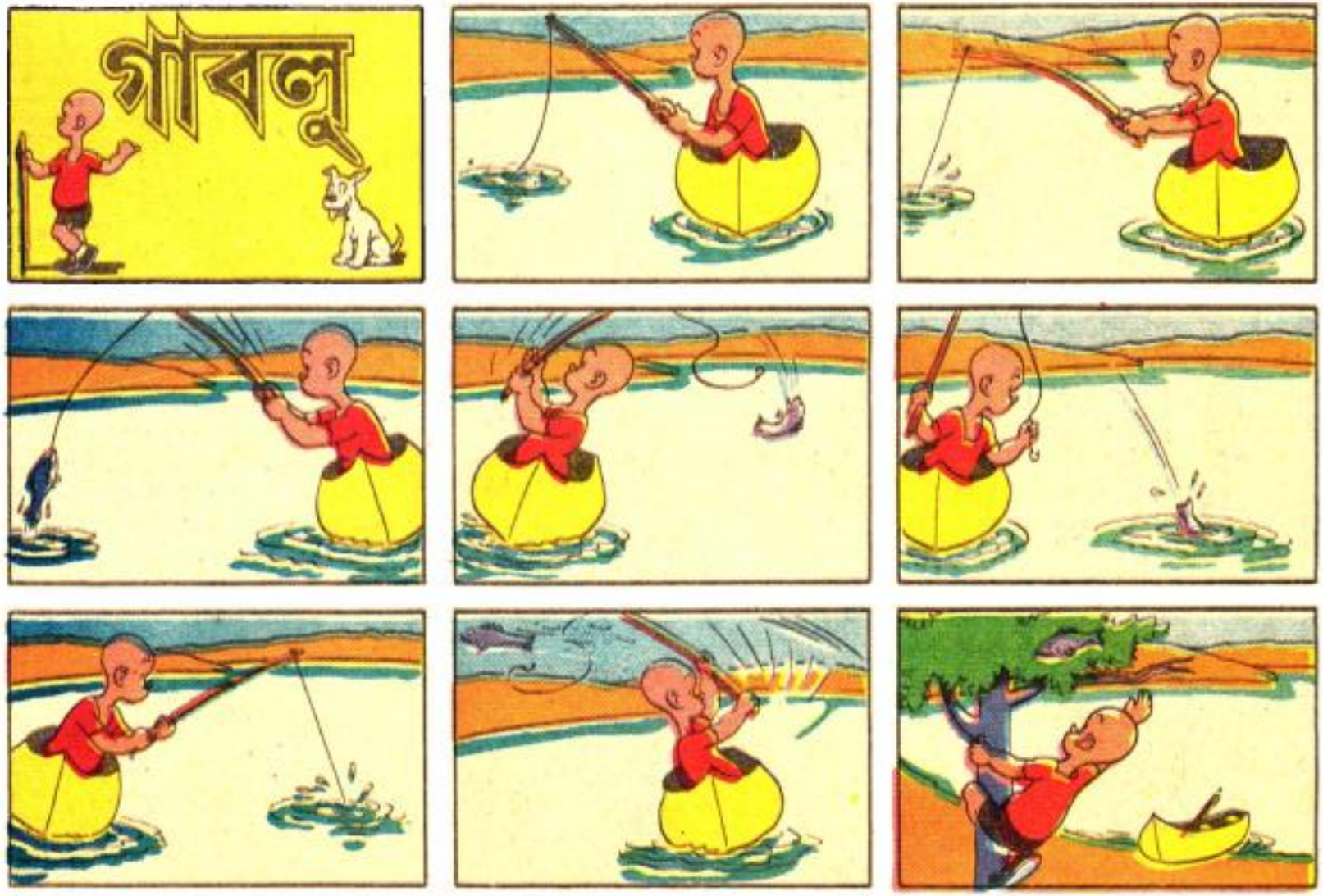
গাবলু

আরও এক দঙ্গল

বাচস্পতি

"কিন্তু 'একলব্য' কী হবে ?" বাবা হঠাৎ বুড়ো আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলেন, যেন একলব্যের ভয়ংকর গুরুদক্ষিণার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর—"'একোলব্বো' না 'অ্যাকোলোব্বো' ?"

"আঁই শাবাশ, বড়দা, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। ওটা 'একোলব্বো'ই স্ট্যাণ্ডার্ড। 'এক' 'অ্যাকো' হয়নি আর 'লব্য' স্বরসংগতির নিয়মে 'লোব্বো' হয়নি।"

"কেন হয়নি ?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

হিগিনকাকু বললেন, "মনে রাখবে, যে-শব্দগুলো আমরা বেশি ব্যবহার করি সেই শব্দগুলোরই ধ্বনি আগে বদলায়। যেগুলো মুখে কম বলি সেগুলোর তত তাড়াতাড়ি চেহারা বদলায় না। 'একলব্য' ঐ রকম একটা কম-চালু শব্দ। যে-মানুষটা আমার বেশি চেনা, তাকে ঘাঁটাতে পারি, তার পেছনে লাগতে পারি, তাকে নিজের ইচ্ছেমতো খানিকটা চালিয়েও নিতে পারি। কিন্তু যার সঙ্গে আলাপ বেশি নেই, তাকে ঘাঁটাতে সাহসই হয় না প্রথমে। শব্দের বেলাতেও তাই। এইজন্যে দেখবে একটা নিয়মের জালে বেশ কিছু শব্দ ধরা পড়েছে, আবার কিছু শব্দ দিব্যি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

ভন্টু বলল, "কাকু, এ-রকম হাওয়ায় হাওয়ায় কথা না বলে দুটো-একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও-না ছাই !"

হিগিনকাকু হেসে বললেন, "ঠিক আছে বাবা, দিচ্ছি। ধরো 'গদ্য' উচ্চারণ করি 'গোদ্দো'। ঠিক আছে, পরের অক্ষরে য-ফলা আগের সিলেব্‌সের অ-কে ও বানাচ্ছে। বহুবার বলেছি সে সব কথা। কিন্তু এরই পাশে দ্যাখো 'মদ্য' বলছি 'মদ্দো' ; 'মোদ্দো' বলছি না। 'সদ্যোজাত' বলছি সদ্দোজাতো, সোদ্দোজাতো বলছি না। তার কারণ আর কিছুই না, 'গদ্য' 'পদ্য'-এর তুলনায় 'মদ্য' 'সদ্য' আমরা কম ব্যবহার করি। 'তথ্য'-ও তাই।"

বাবা বললেন, "হচ্ছিল তো অ্যা-র কথা।"

হিগিনকাকু বললেন, "অ্যা-র কথা আর কত বলব। এবার একটা লিস্টি দিয়ে দিই শব্দের। গোড়ায় 'এ' থাক, এ-কার থাক—সবগুলোই উচ্চারণে 'অ্যা' হবে। সবগুলো দিচ্ছি না—যেগুলো নিয়ে গোলমাল বেশি সেগুলোই দিচ্ছি। নে ভন্টু, লেখ্ বাবা—" বলে হিগিনকাকু রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে বলে গেলেন, "এলাচ, কেরানি, কেরামতি, খেলনা, খেসারত, গেঁড়াকল, চেলাকাঠ, জেঠা, ঠেঙা, ঢেঁড়া, ঢেলা, তেলাপোকা, দেওর, নেওটা, নেড়া, পেখম, পেটরা, ফেনা, বেগার, বেচারা, বেচারি, বেলা (সন্ধ্যা'বেলা' ; কিন্তু সমুদ্র'বেলা' এ দিয়ে), বেসন, ভেজাল, ভেলা, মেনকা, মেরামত, লেজ, শেওড়া, শেওলা, হেনস্তা, হেলা (অব'হেলা')।"

"কালো কফি দাও ! শিগ্‌গির !" বাবা আর্তনাদ করে ডাকলেন। (ক্রমশ)

বেড়াতে গিয়ে

প্রসাদ

তেমন দূরে কোথাও নয়, এবার বড়দিনের ছুটিতে মিলিরা বিহারের একটা ছোট গ্রামে কয়েকদিন কাটিয়ে এল। মিলির বাবার এক বন্ধুর সুন্দর একটি বাংলো, সেই বাংলো ঘিরে ফুলফলের মস্ত বাগান, বাগান ঘিরে ধু ধু করছে উঁচুনিচু পাথুরে জমি, দূরে দূরে দেখা যায় মেঘের মতো পাহাড় :

Milly loved the place.

But at night it was so quiet and it was so dark and strange outside that she felt just a little afraid.

She went to bed early.

সেদিন এক কাণ্ড। মনে করলেই মিলির সারা গায়ে কাঁটা দেয়।

Mummy was putting a clean sheet on the bed.

Milly was helping her.

Suddenly Mummy gave a cry.

There was a scorpion in the bed.

Daddy and Chambal rushed in from the next room.

But the scorpion was gone by then.

When Daddy heard about it he looked worried.

They looked everywhere for the scorpion but it had vanished.

শুধু কাঁকড়াবিছে নয়, সাপেরও খুব উপদ্রব সেখানে। মিলিদের বাড়িতে যে লোকটি কাজ করত, সে বলল, আশপাশের গ্রাম থেকে সাপের কামড়ের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়।

Daddy said scorpions could be as deadly as venomous snakes.

When stung by a scorpion a man may have to be sent to hospital.

কিন্তু সেখানে কোথায় হাসপাতাল ?

The nearest hospital was miles

away.

Milly had seen the hospital.

Daddy had pointed it out to her.

যাই হোক, তারপর থেকে মা শোবার আগে প্রত্যেকটি বিছানা না-ঝেড়ে ছাড়েন না। তবু সন্ধ্যা হলেই মিলির গা কেমন শিরশির করে।

কিন্তু সারাদিন যে কী ভাল লাগে, বলবার নয়। ক'দিন পরেই আবার কলকাতায় ফিরে যেতে হবে মনে করলেই তার মন খারাপ হয়ে যেত।

She didn't like to think that soon the holiday would be over.

Then, back in Calcutta, her daily routine would begin again.

She'd have to go to school every morning.

হঠাৎ তার মনে হল, আচ্ছা এখানে কি কোনো ইস্কুল নেই ?

She asked Daddy.

Daddy said that there was a school in the next village.

She saw the school one day.

It made her sad to think that children everywhere have to go to school.

লক্ষ করো :

She went to bed.

Mummy was putting a sheet on the bed.

He had to be sent to hospital.

Milly had seen the hospital.

She'd have to go to school.

She saw the school one day.

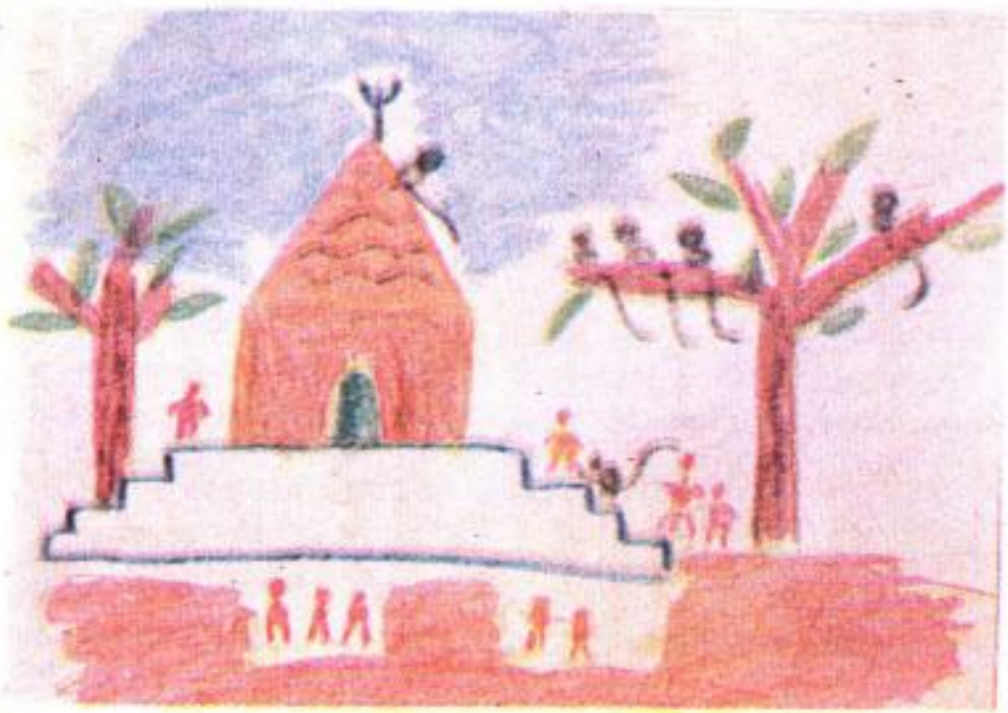

বাঁদর এসে মালা নিল

কিছুদিন আগে বাপি, মা, ভাই, ছোটমামা আর আমি রাজগির ও কাশী থেকে বেড়িয়ে এলাম। রাজগিরের সারদা আশ্রমে ছিলাম আমরা। ওখানকার খাজা খেয়ে খুব ভাল লেগেছিল। রোপওয়ে বন্ধ ছিল বলে চড়তে পারিনি। রাজগির থেকে কাশী গেলাম।

সেখানে খুব মজা হল। একদিন দুর্গা-মন্দিরে গেছি, চারিদিকে কত বাঁদর। ছোট-বড় বাঁদর। আমার ভাই রানার গলায় একটা গাঁদাফুলের মালা ছিল। তুলসী-মন্দিরের পুরোহিতদাদু ওকে সেটা দিয়েছিলেন। একটা বাঁদর হঠাৎ রানার কাছে এসে ওর হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল।

বাপি তাই দেখে তাড়াতাড়ি এসে গাঁদাফুলের মালাটা ওর গলা থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। বাঁদরটা তখন রানাকে ছেড়ে মালাটা নিয়ে চলে গেল একটা গাছে। সবাই বলল, ওরা ফুলের ভেতরটা খেতে ভালবাসে তো, তাই মালাটা নিতে এসেছিল।

মামা রানাকে বললেন, "তোর বন্ধু তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ভাই কিন্তু একটুও কাঁদেনি।

ছবি ও লেখা : সহেলি মুখোপাধ্যায় (বয়স ৭)

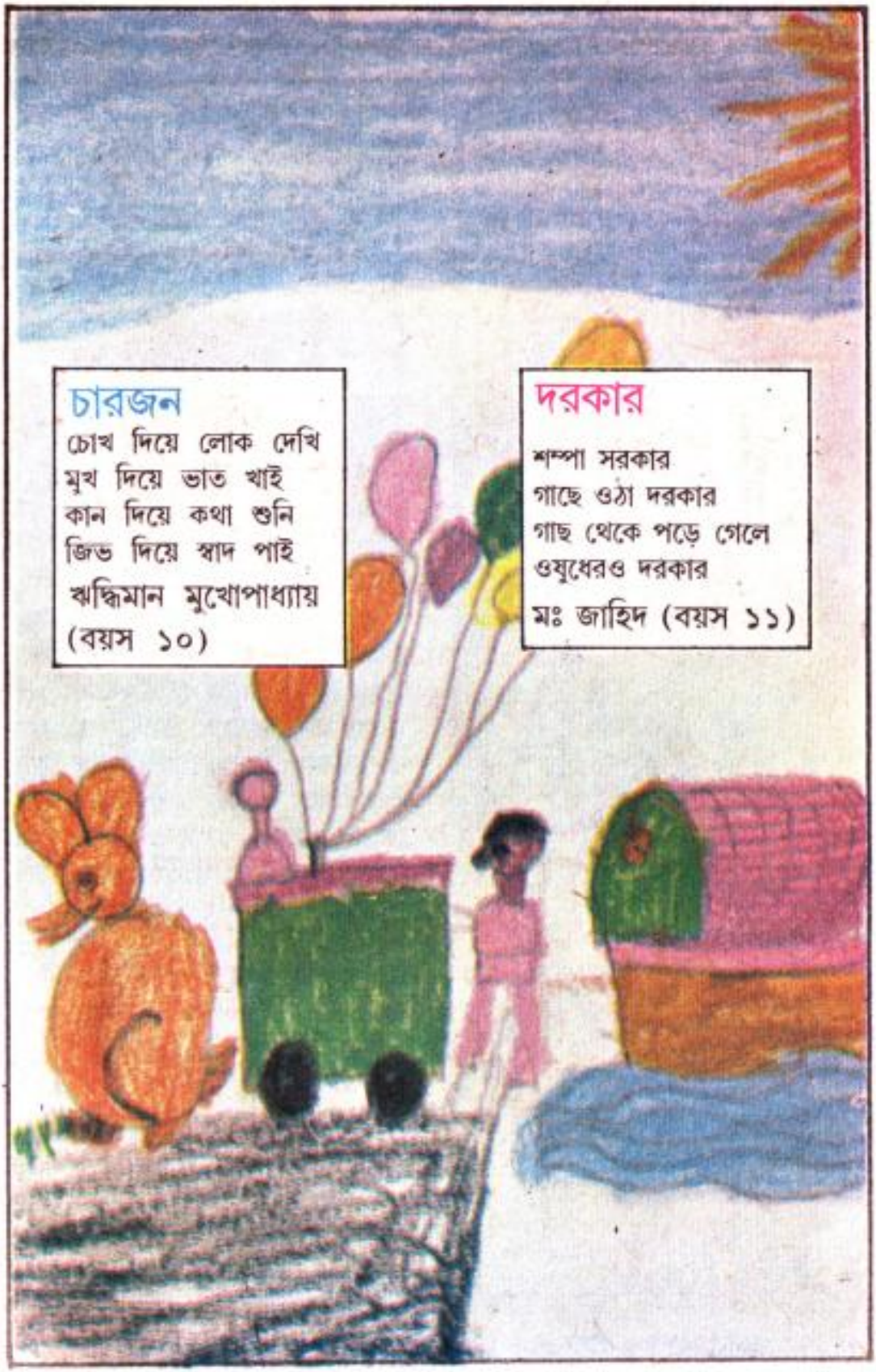
চারজন
চোখ দিয়ে লোক দেখি
মুখ দিয়ে ভাত খাই
কান দিয়ে কথা শুনি
জিভ দিয়ে স্বাদ পাই
ঋদ্ধিমান মুখোপাধ্যায়
(বয়স ১০)
দরকার
শম্পা সরকার
গাছে ওঠা দরকার
গাছ থেকে পড়ে গেলে
ওষুধেরও দরকার
মঃ জাহিদ (বয়স ১১)

দিদুর বিছানায়

দিদুর পুষি দিদুর সাথে
শোয় বিছানায় রোজ রাতে
সেদিন দেখি ঘরে দিদুর
করছে খেলা বেড়াল ইঁদুর
এখন থেকে রাত্রে দিদুর
দুপাশে শোয় বেড়াল ইঁদুর।

রণদেব গোস্বামী (বয়স ১৩)

ছবি : অর্ণব গুহ (বয়স ১০)

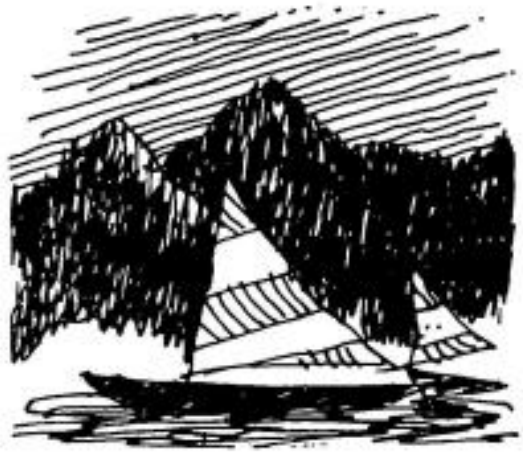

পাহাড়ের দেশে

স্কুলের ছুটিতে আমি আমার বাবা আর মায়ের সঙ্গে নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিলাম। নৈনিতাল শহরটা খুব সুন্দর। চারপাশে পাহাড়।

আমি একদিন ঘোড়ায় চেপেছিলাম। পাহাড়ের ধারে লেক আছে। লেকের জলে আমরা বোটে চেপেছিলাম। ওখান থেকে আমরা করবেট্ পার্কে গিয়েছিলাম।

হাতির পিঠে চড়ে বাঘ দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। বাঘ দেখতে না পেলেও বাঘের থাবার দাগ দেখতে পেয়েছি। অনেক হরিণ আর হাতিও দেখেছি। আমাদের হাতিটার নাম ছিল রূপকলি।

করবেট পার্ক থেকে বাসে চেপে আমরা কৌসানি গিয়েছিলাম। কৌসানি থেকে হিমালয়ের কয়েকটি চূড়া দেখা গিয়েছিল।

নৈনিতাল থেকে আলমোড়া আর রানিখেতে গিয়েছিলাম। জায়গাদুটো খুব সুন্দর। চারপাশে পাহাড়। ফেরার সময় আমরা এক দিন লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। ওখানকার কয়েকটা জায়গা দেখে বাড়ি ফিরে এলাম।

সুদেষ্ণা পাল (বয়স ৭)

ভূতের হাসি

আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ি আছে। ভুতুড়ে বাড়ি। মাঝরাতে সেই বাড়ি থেকে অট্টহাসি ভেসে আসে। এই রহস্য ভেদ করার জন্যে আমাদের পাড়ার কয়েকটা ছেলে একদিন মাঝরাতে সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকল।

তারা বাড়িতে ঢোকার আগে পুলিশকে খবর দিয়ে রেখেছিল। এক গাড়ি পুলিশ বাড়িটা ঘিরে রেখেছিল।

আমাদের পাড়ার ছেলেরা ওই বাড়িতে ঢুকে দেখে, কয়েকটা লোক বসে-বসে কী যেন করছে। ওদিকে টেপ-রেকর্ডারে সেই ভূতের হাসি বাজছে।

ছেলেরা বাঁশি বাজাতেই পুলিশ এসে লোকগুলোকে ধরে ফেলল। পরে জানা গেল, ওই লোকগুলো ভূতের হাসির রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে জাল টাকা তৈরি করত।

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স ১২)

জেদি ছেলে

রিন্টু খুব জেদি ছেলে। সে তার মা'র কথা শুনত না। বিকেল হয়েছে। রিন্টু তার মা'র কাছে গিয়ে বলল, "মা, বিকেল হয়েছে, এবার আমায় ভাল জামা-প্যান্ট পরতে দাও।"

এই কথা শুনে তার মা তাকে দুটো জামা এবং দুটো প্যান্ট বার করে দিয়ে বললেন, "নে, এর মধ্যে যে-কোনো একটা জামা আর প্যান্ট পরে নে।"

তখন রিন্টু বলল, "আমি এটা পরব।" তার পরেই বলে উঠল, "না-না, আমি ওটা পরব।" এইভাবে বারবার বলতে বলতে সন্ধে হয়ে গেল। তখন সে বলল, "এখন আর পরে কী লাভ, এখন তো বাড়িতেই থাকতে হবে।"

এইভাবে সেদিন সে বেশ জব্দ হয়েছিল।

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স ৯)

ছবি : কাকলি ভট্টাচার্য (বয়স ১০)

বাঘা

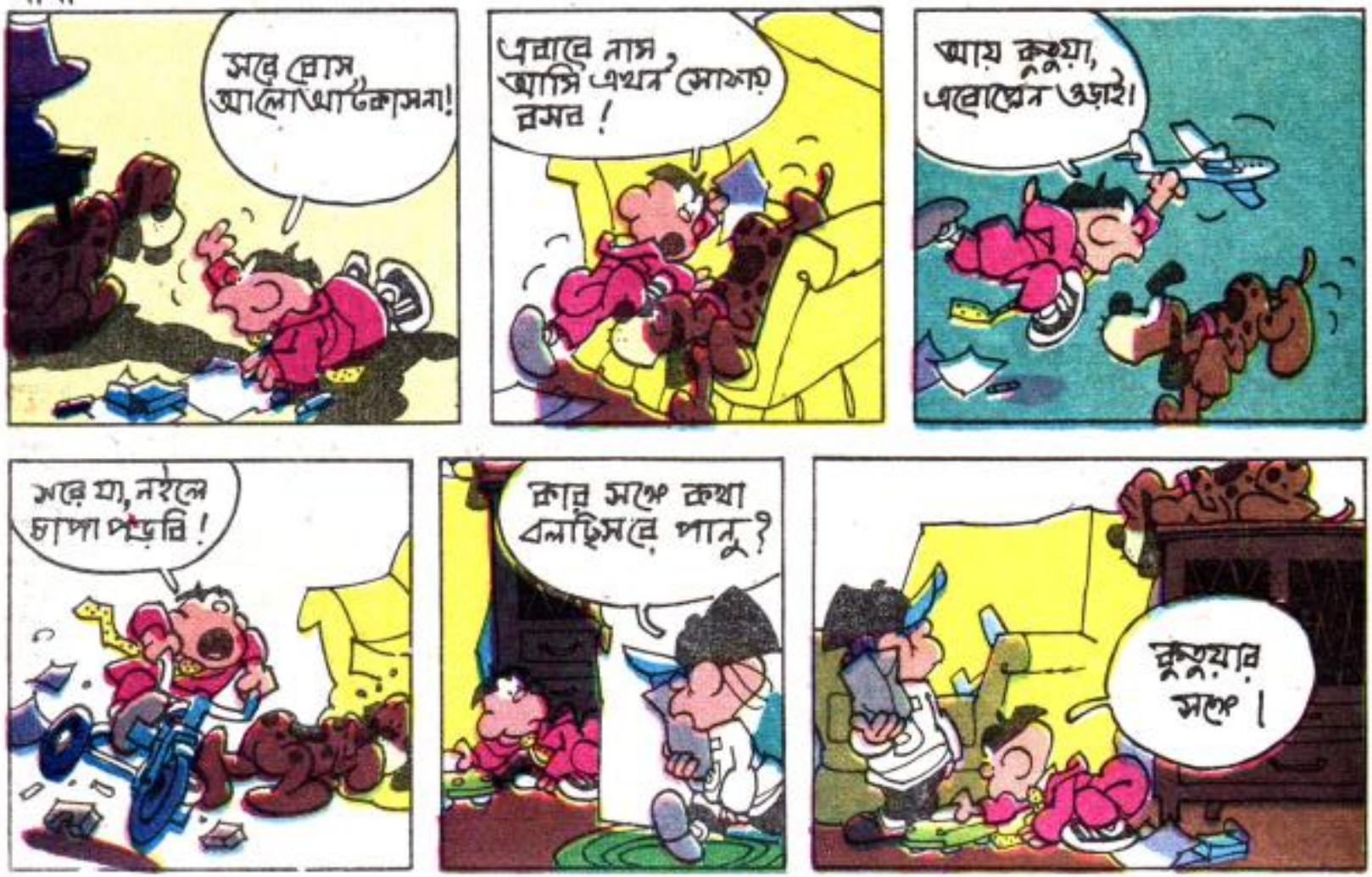

সরে বোস, আলো আটকাসনা!
এবারে নাম, আমি এখন সোফায় বসব!
আয় কুকুয়া, এরোপ্লেন ওড়াই।
সরে যা, নইলে চাপা পড়বি!
কার সঙ্গে কথা বলছিসরে পানু?
কুকুয়ার সঙ্গে।

এত ভাল যে নিজের কাছে রাখা যায় না

কোকোনাট কুকিজ, ল্যাকটোবন্‌বন্‌, টফিজ
কোকোনাট ক্রাঞ্চ এবং সফ্‌ট সেন্টার্ড সুইটস্‌,
পিপারমিন্ট রোলস্‌, মিনিপপস্‌।

MORTON

SWEETS OF DISTINCTION

মর্টন কনফেক্‌শনারী এণ্ড মিল্ক প্রোডাকটস্‌ ফ্যাক্‌টরী

পোঃ মাঢ়ৌরা (জিলা ঃ সারন) বিহার।

CC/M-1/81/BEN

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৮৮

HTC-GDP-3760R